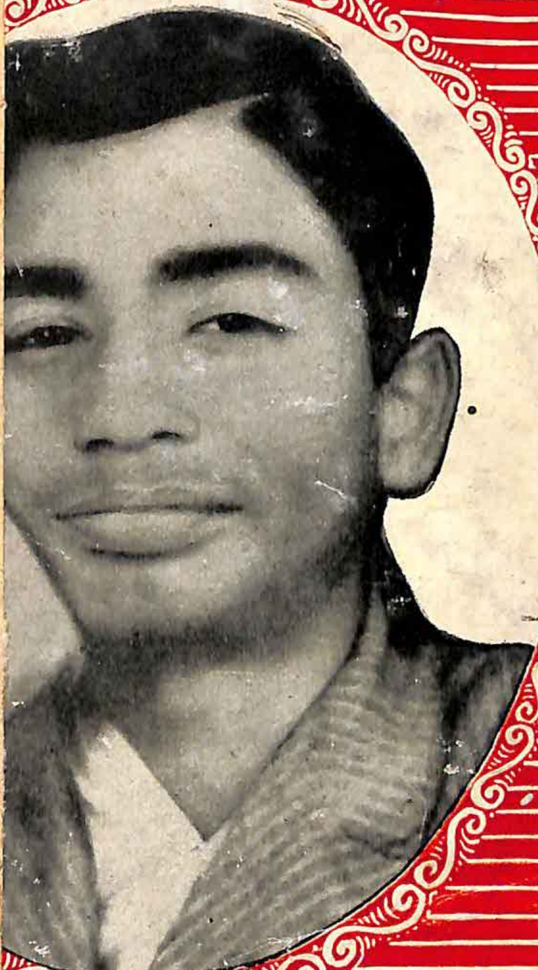




কবি সুকান্ত

কবি সুকান্ত

ভুপেন ভট্টাচার্য

বসাক বুক ষ্টোর :: ৪, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা - ১২

প্রকাশক :
শ্রীবিশ্বনাথ বসাক
৪, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা - ১২

প্রথম প্রকাশ :
শ্রাবণ ১৩৭৯

প্রচ্ছদ : সত্য চক্রবর্তী

মূল্য—চার টাকা

মুদ্রাকর :
কৃষ্ণমোহন ঘোষ
দি নিউ কমলা প্রেস
৫/২ কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট
কলিকাতা ৯

এই লেখকের অন্যান্য বই :

বিনয়-বাদল-দীনেশ

ক্ষুদিরাম-বাঘাযতীন-প্রফুল্লচাকী

রাজা রামমোহন (যন্ত্রস্থ)

—উৎসর্গ—

সুকান্ত অনুরাগীদের উদ্দেশ্যে

॥ আমার কথা ॥

কবি সুকান্ত মাত্র একুশ বছর বেঁচে ছিলেন পৃথিবীতে। যদিও জীবনকাল খুবই স্বল্পস্থায়ী তবু তার মধ্যেই তিনি বাংলার কাব্য-জগতে যে সম্পদ রেখে গেছেন তা অতুলনীয়। তিনি জাতির নিষ্প্রাণ ও নিরুৎসাহ সত্তাকে নতুন করে স্পন্দিত করে তুলেছিলেন। কৃষান, মজুরের তিনি ছিলেন সত্যিকারের অংশীদার। সুকান্ত চেয়েছিলেন, নতুন এক পৃথিবী গড়তে। যে পৃথিবী শাসন করবে, ভোগ করবে ক্ষেতে-খামারে, কলে-কারখানায়, শহরে-গঞ্জে খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ। আর সেই সঙ্গে অবসান চেয়েছিলেন সবলের নির্যাতন, অবহেলা, লাঞ্ছনা এবং প্রপীড়নের। তাই তিনি যখন তাঁর জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতাকে কবিতার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে শুরু করেছিলেন ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁকে এই পৃথিবী থেকে মৃত্যুর নির্মম হিম-শীতল স্পর্শে বিদায় নিতে হয়েছিলো।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, আজও সুকান্তর সত্যিকারের জীবনীগ্রন্থ যথেষ্ট পরিমাণে প্রকাশিত হয়নি। তাই তাঁর স্বল্পস্থায়ী জীবনের বিভিন্ন ঘটনা ও কাব্য প্রতিভাকে এই গ্রন্থে নিষ্ঠার সঙ্গে ফুঁটিয়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছি। কারণ, দেশের মানুষ সুকান্তকে আরও নিবিড়ভাবে জানার এবং চেনার সুযোগ লাভ করুক।

প্রসঙ্গত, এই জীবনীগ্রন্থ লিখতে গিয়ে 'সুকান্ত বিচিত্রা' ও 'সুকান্ত স্মৃতি' এবং আরও দু'একখানা পুস্তক থেকে কিছু কিছু তথ্যের সাহায্য নিতে হয়েছে, এ জন্য প্রত্যেকের কাছে আমি আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ।

শ্রাবণ, ১৩৭৯
কলিকাতা। } ভূপেন ভট্টাচার্য

মনের গভীরে একটা প্রকাণ্ড আগ্নেয়গিরি প্রতিনিয়ত জ্বলছে, তবু অদ্ভুত লাগে ভাবতে—না, কোন বহিঃপ্রকাশ নেই চোখে-মুখে। হৃদয়ে চাপা প্রচণ্ড ঘৃণা, তবু বাইরে কি সুন্দর হাসি-খুশি ছড়ানো মুখ। সত্যি অবাক হতে হয়, যার অন্তরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে, তার বাইরের রূপ এমন সদা হাস্যময় হয় কেমন করে!

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয় ভাবলে।

হ্যাঁ, সারল্যের প্রতীক বুঝি সেই মুখ। সে যে মুক্ত সকল রকম কলুষ থেকে। না, পার্থিব কোন কলুষই তাঁর দেহ-মন স্পর্শ করতে পারেনি।

আবার কখনও দেখতে পাওয়া যেতো, কত সহজ সরলভাবে হাসি মুখে কথা বলতে বলতে এক সময় কি প্রচণ্ড স্তব্ধতায় অদ্ভুত রকম গম্ভীর হয়ে যেতে।

চার দেয়ালের মাঠকোঠা বাড়ীর জানালার কাছে বসে উদাস দৃষ্টি চলে যেতো দূরে—বহু দূরে। বাইরে আকাশের গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেন চলতো সেই দৃষ্টি। কে জানে, এমন আপনভোলা নির্নিমেষ দৃষ্টি চালিত করে কি দেখতো! এমন করে নীরব চাহনিতে কি ভাবতো!

স্বচ্ছ আকাশ।

না, আকাশে মেঘের ঘনঘটা নেই। নেই কোন বিচিত্র শোভা। শুধু দুপুরের স্তব্ধ খট্‌খটে রৌদ্রের ত্যেজ ছাড়া ঐ আকাশ থেকে আর কিছুই নিক্ষিপ্ত হচ্ছে না।

গভীর ভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় গোটা দুই চিল ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে। আর কখনও-বা মাঝে মধ্যে পাক খাচ্ছে ওদের আপন স্বভাবসিদ্ধ চরিত্রে।

না, এ ছাড়া আর কিছুই নেই দৃষ্টিপথের নাগালের মধ্যে।

চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যেতো, সেই দৃষ্টি যেন কত তাৎপর্যপূর্ণ। তাই তো ঐ নির্নিমেষ দৃষ্টির মধ্যে মুহূর্তের মধ্যে রূপের পরিবর্তন দেখা দিতো।

সহসা সেই নিষ্পলক চোখে দেখা দিতো বিদ্যুতের ঝলক। দৃষ্টি এড়ায় না। শুভ্র আকাশের কোলে পরম নিশ্চিন্তে, কত আরামে ভেসে চলেছে ঐ চিল দুটো। এ বুঝি ওদের জন্মগত অধিকারে প্রাপ্ত।

আকাশের ঐ হিংস্র এবং রক্তপায়ী এক জোড়া চিল এমন আনন্দে ঘুরে বেড়াবে, সমস্ত রকম সুখ ভোগ করবে, একি কোন বিদ্রোহী কবি-হৃদয় সহজভাবে মেনে নেয়! না কি নিতে পারে?

আশ্চর্য!

ভাবতে অবাক লাগে কি বিচিত্র এই পৃথিবী। ধনতন্ত্রের দেশে কিন্তু এই নরখাদক চিল-ই সম্মানিত হয়েছে। আসন পেয়েছে তাদের জাতীয় পক্ষীরূপে।

না, কোন বিদ্রোহী কবিচিত্ত একে সহজ ভাবে মেনে নেবে না। তাই বুঝি অসি থেকে সহস্রগুণ ক্ষুরধার লেখনী বেছে নিয়েছিলেন একজন কিশোর কবি।

চির কিশোর সুকান্ত। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য।

হ্যাঁ, তিনি যে দেখেছেন নিরীহ লোকের খাদ্যসামগ্রীর উপর চিলের ছোঁ-মারার দস্যুপ্রবৃত্তিকে।

সে অভিজ্ঞতা সুকান্তরও ছিলো।

ছোটবেলায় একবার তিনি পাড়ার দোকান থেকে ছোট্ট শাল-পাতায় মুড়ে হালুয়া-কচুরী কিনে নিয়ে ফিরছিলেন বাড়ীর দিকে। হঠাৎ এক চিল কোথা থেকে এসে ছোঁ মেরে নিয়ে গিয়েছিলো হাতে মোড়া ঐ বস্তুটি।

হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন সুকান্ত। তাই বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিলেন তার মুখের খাবার ছিনিয়ে নেওয়া ঐ উড়ন্ত চিলটির দিকে।

ফ্যাকাশে মুখ সুকান্তর। কি ভাবছিলেন তাকিয়ে তাকিয়ে কে জানে!

কিছুদিন পরের ঘটনা।

একদিন সুকান্তদেরই বাড়ীর কাছাকাছি রাস্তায় টেলিগ্রাফের তার লেগে মরে যেতে দেখেছেন এক চিলকে। সে কি আনন্দ সুকান্তর। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন অনেকক্ষণ।

চোখের কোণে খুশীর ঝল্‌কানি। মনের ভাবটা তার অনেকটা এই রকম যে, এই তো সেদিন শ্যেনদৃষ্টি নিক্ষেপ করে খাবারটা ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিলে! কেমন ফল হলো এখন?

এই ঘটনার পরেই সম্ভবত কিশোর বয়সে সুকান্ত লিখেছিলেন—

> পথ চলতে চলতে হঠাৎ দেখলাম ঃ
> ফুটপাতে এক মরা চিল!
>
> ... .
>
> অনেক উঁচু থেকে যে এই পৃথিবীটাকে দেখেছে,
> লুণ্ঠনের অবাধ উপনিবেশ;
> যার শ্যেনদৃষ্টিতে কেবল ছিল
> তীব্র লোভ আর ছোঁ মারার দস্যুপ্রবৃত্তি—
> তাকে দেখলাম, ফুটপাতে মুখ গুঁজে প'ড়ে।
>
> ... .
>
> অনেকে আজ নিরাপদ;
> নিরাপদ ইঁদুরছানারা আর খাদ্য-হাতে ত্রস্ত পথচারী,
> নিরাপদ—কারণ আজ সে মৃত।

বেশীদিন আগের কথা নয়। এই তো অল্প কিছুদিন আগের কথামাত্র।

বাংলা ১৩৩৩ সালের ৩১শে শ্রাবণ। সেদিনই কোলকাতার কালিঘাট অঞ্চলের মহিম হালদার ষ্ট্রীটে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন সুকান্ত।

নবজাত শিশু ভূমিষ্ঠ হলে বাড়ীর সকলেই আনন্দে পুলকিত হয়ে উঠলেন। সকলেই অধীর হয়ে উঠলেন নবজাত শিশুকে দেখার জন্য।

আনন্দে আত্মহারা মাতামহ সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য। তাঁর মনে আনন্দ আর বাধ মানতে চায় না। খুশীর জোয়াড়ে তাঁর প্রাণমন যেন নৃত্য করে চলেছে। এই সুসংবাদ তিনি মুহূর্তের মধ্যেই চারিদিক প্রচার করে দিলেন।

সুকান্তর পিতার নাম—নিবারণ ভট্টাচার্য। মাতা—সুনীতি দেবী। তাদের আদিবাস ছিলো পূর্ব বাংলার (বর্তমান বাংলাদেশ) ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোটালী পাড়ায়।

সুকান্তর পিতামহ শ্রীজগৎ চন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁর নিজের নাবালক পুত্রদের রেখে পারলোক গমন করেন। ফলে এক বিরাট দারিদ্র্যের মধ্যে দিন অতিক্রম হয়েছে নিবারণবাবুর। বহু কষ্টে ও অসুবিধায় তাকে দিনপাত করতে হয়েছে।

তবু সত্যি কথা, দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর মুহূর্তগুলো কিন্তু তাকে মতিভ্রমে পরিণত করেনি। কিংবা সৎপথ থেকে এক চুলও এদিক ওদিক সরিয়ে নিতে পারেনি। মূর্দা কথা, জীবনে পথ ভ্রষ্ট হর্নান তিনি কখনও।

সবই ভাগ্য।

ভাগ্য ছাড়া আর কি। বাল্য আর কৈশোর অবস্থা নিবারণবাবুর কেটেছে বিভিন্ন দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিয়ে। এই কারণে তিনি উচ্চশিক্ষা লাভ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন।

তিনি ছিলেন ভাগ্য ও ঈশ্বর বিশ্বাসী।

তাই তাকে আশৈশব ভীষণভাবে পরিশ্রম করে সর্বক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে হয়েছে। সংগ্রাম করতে হয়েছে প্রতিটা মুহূর্ত নিজের ভাগ্যের সাথে।

না, ভেঙ্গে পড়ার লোক ছিলেন না সুকান্তর পিতা। শত বিপদেও হতাশ হননি তিনি। ভেঙ্গে পড়েননি কখনও।

সংসার তাকে করতে হয়েছে। আর সেই সংসারের শ্রীবৃদ্ধির জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তাঁর জীবনে নিষ্ঠা ও একাগ্রতা ছিলো ভীষণ রকম। তিনি যজমানী করে সংসারের একটা বৃহৎ অংশ পূরণ করতেন। এই যজমানীতে তাঁর প্রভূত যশ ছিলো শুধু তাঁর নিষ্ঠা ও যত্নের জন্য।

উত্তর কোলকাতার বাগবাজারের নিবেদিতা লেনের একটা বাড়ীতে সুকান্তর বাল্যকাল কেটেছে।

খুবই সাধারণ বাড়ী ওটা।

এই সাধারণের মধ্যে ও অসাধারণত্ব দেখেছেন শিশু সুকান্ত। এখানে এসেছেন তৎকালীন বহু জ্ঞানীগুণী লোক। কত আলাপ আলোচনার সামান্য সামান্য অংশ তার শিশু মনে দাগ কেটে গেছে। সুকান্ত তন্ময় হয়ে শুনতেন। ঐটুকু বয়সে কি বুঝতেন কে জানে!

কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য ছিলেন সুকান্তর জ্যাঠামশাই। তিনি ছিলেন সংস্কৃতে সুপণ্ডিত। উপাধীধারী। শুধু সংস্কৃতেই নয়, আরও বিভিন্ন বিষয়ে তখনকার দিনে উপাধী লাভ করতে পেরেছিলেন তিনি।

সাহিত্য?

হ্যাঁ, কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান সাহিত্যসেবী। নিয়মিত সাহিত্যের আসর বসতো তাঁর বাড়ীতে। সেই সাহিত্য আসরে

তৎকালীন কত সাহিত্যরসিক বিদগ্ধজন আসতেন। জমায়েৎ হতেন। আলোচনায় অংশ নিতেন। তবে এই সাহিত্য আসরের কাজকর্ম ও আলোচনা চলতো খাঁটি সংস্কৃত ভাষায়।

বালক সুকান্ত কাছাকাছি ঘুরাফেরা করতেন। ছোট্ট বয়স থেকেই তার মনে ছিলো অদম্য কৌতূহল। হয়তো বা ঐ সব আলোচনা থেকে বালক সুকান্ত কিছু আলোচনার কিঞ্চিৎ অস্বাদন লাভ করতে চাইতেন। ভাবলে অবাক হতে হয়, ঐ খট্‌মট্ ভাষা সংস্কৃত বালক সুকান্ত কি করে বুঝতেন!

শুধু সংস্কৃতে নয়, বাংলাতেও একটি নব্য সাহিত্য চক্রের সৃষ্টি হয়েছিলো তখন। সেই সাহিত্য চক্রের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সুকান্তর এক দূর সম্পর্কের কাকা আর তার জ্যাঠতুতো ভাই অর্থাৎ কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র শ্রীরাখাল ভট্টাচার্য। এই নব্য সাহিত্যচক্রেও তখনকার দিনে নবীন সাহিত্যিকরা আলোচনাচক্রে যোগদানের জন্য আসতেন।

সুকান্ত বালক বয়সের দৃষ্টি নিয়ে পরম কৌতুকে তার বাড়ীতে সর্বশ্রেণীর সাহিত্যসেবীদের যাতায়াত লক্ষ্য করতেন। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠতেন।

সুকান্ত আজকের দিনের একটি অবিস্মরণীয় নাম। তার এই নামকরণের একটি সুন্দর ইতিহাস আছে। বাংলার কাব্য পাঠকদের কাছে এই প্রিয় নামটি কি করে এলো?

একান্নবর্তী পরিবার সুকান্তদের তখন।

সাহিত্যানুরাগী এই পরিবারের প্রায় সকলেই। তখন তাদের প্রিয় লেখক ছিলেন সুসাহিত্যিক মনীন্দ্রলাল বসু মহাশয়। তিনি তার কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন 'রমলা' রচনাতে।

মনীন্দ্রলাল বসুর রচনা বিশেষ করে তরুণদের মনে খুব উৎসাহের

সঞ্চার করতো। এক কথায় তিনি ছিলেন তরুণদের অত্যন্ত প্রিয় লেখক।

তিনি ছোট গল্পও বেশ কিছু লিখেছেন। তার মধ্যে তাঁর 'সুকান্ত' নামে একটি ছোট গল্প প্রকাশিত হয়েছিলো। গল্পটি সাহিত্য-গুণে খুবই সুন্দর হয়েছিলো সেদিন। আর এই পরিবারের তরুণ সম্প্রদায়কে গল্পটি খুবই আকর্ষণ করেছিলো। তাদের তখন সবচেয়ে প্রিয় গল্প ওটা।

সে সময় নিবারণ ভট্টাচার্যের পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন কালিঘাটে। পুত্র হয়েছে শুনে বাড়ীর সবাই যখন আনন্দে আত্মহারা, তখন রাণীদি অর্থাৎ কৃষ্ণচন্দ্রের কন্যা সঙ্গে সঙ্গে তার এই ছোট্ট ভাইটির নামকরণ করে ফেললেন 'সুকান্ত'।

আশ্চর্য!

কি অদ্ভুত ভাবে গল্পের সুকান্তর সঙ্গে বাস্তবের সুকান্তর মিল হয়ে গেল একদিন! গল্পের সুকান্তর মৃত্যু হয়েছিলো যক্ষ্মারোগে। আর বাস্তবের সুকান্তও মাত্র একুশ বছর বয়সে সেই যক্ষ্মারোগে মারা গেলেন। রাণীদির অকাল মৃত্যুর ষোল বছর পরে ঘটে ছিলো ঘটনাটি। তিনি বেঁচে থাকলে এই পৃথিবীতে বোধহয় সকলের থেকে বেশী আঘাত পেতেন তিনিই।

সত্যি, এমন অবাককাণ্ড খুবই কম দেখা যায়।

সুকান্তর প্রিয় দিদি রাণীদি অনেক সখ করে তার প্রিয় ছোট্ট ভাইটির নাম রেখেছিলেন। খুবই স্নেহ করতেন রাণীদি তাকে। পরে সুকান্তর শৈশবের মাতৃহারা অবস্থায় তিনিই ছিলেন তার একমাত্র আশ্রয়স্থল। এই রাণীদির কোলেই কেটেছে তার ঐ বয়সের প্রায় অধিকাংশ সময়। তারই বিছানায় বুকের কাছে কেটেছে অসহায় সুকান্তর কত রাত।

এমনি ভাবে সুকান্ত লালিতপালিত হয়েছিলেন তার রাণীদির অপত্যস্নেহে।

রাণীদির যত্নে ও স্নেহে ধীরে ধীরে সুকান্ত বড় হতে লাগলেন।

প্রায় রোজই বালক সুকান্তকে ঘুমপারাতে গিয়ে কিংবা এমনিতেও কত ছড়া, কত কবিতা আবৃত্তি করে শুনাতেন। শিশু সুকান্ত খুব মন দিয়ে শুনতেন সে সব ছড়া, কবিতাগুলো। যদি কখনও বা রাণীদি আবৃত্তি করতে করতে থেমে যেতেন, তবে সুকান্তই তাকে উত্যক্ত করে তুলতেন পুনরায় আরম্ভ করার জন্য। আর রাণীদিও তার আব্দার কখনও উপেক্ষা করতেন না।

বিশেষ করে, রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলো বালক সুকান্তর মনে দোলা দিয়ে যেতো। অনেক সময় আধো আধো স্বরে সুকান্তও রাণীদির গলার সাথে গলা মিলিয়ে আবৃত্তি করতেন। আর আবৃত্তি করার আনন্দে খুশীতে উপচে উঠতেন।

একথা আজ অস্বীকার করার কোন কারণ নেই, সুকান্তর এই কবিসত্বার বীজ তার প্রিয় রাণীদিই হয় তো তার মনের মণিকোঠায় সযত্নে একদিন বপন করেছিলেন।

তারই পরিণতি পরবর্তী জীবনে এসেছিলো সুকান্তর।

রাণীদিই প্রথম পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন বিশ্বের মহান কবি রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে বালক সুকান্তর। এ জন্যেই তিনি পরে রবীন্দ্রকাব্যের খুব অনুরাগী হয়েছিলেন সম্ভবত। আর ঐ শিশু অবস্থাতেই বিশ্বের মহানকবিকে তার হৃদয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্থান দিয়েছিলেন।

সুকান্ত ও কি কবিতা লিখে রবীন্দ্রনাথের মতো বড় কবি হতে চেয়েছিলেন ?

সম্ভবত তাই।

সুকান্ত তার স্বল্প জীবনের পরিসরে একজন কবি হয়েছিলেন একথা আজ খাঁটি সত্য।

যতদূর মনে পড়ে সুকান্ত প্রথম কবিতা লেখে জসিডিতে বেড়াতে গিয়ে। সেটা ছিলো ১৯৩৫ সালের কথা।

সাঁওতাল পরগণা।

বায়ু পরিবর্তনের জন্য বাড়ীর সবাই বেড়াতে গিয়েছিলেন সেখানে, সঙ্গে গিয়েছিলেন সুকান্তর প্রায় সমবয়সী বোন রমা। অর্থাৎ তার একান্ত প্রিয় রাণীদির মামাতো বোন।

সেখানে বসে বসেই ছড়ার আঙ্গিকে লিখলেন সুকান্ত—

রমা রাণী দুই বোন পরীর মতন,
সবে বলে মেয়ে দুটি লক্ষ্মী কেমন।
দুই বোন রমা রাণী—
সবে করে কানাকানি,
দুই বোন হবে ভালো,
করিবে যে ঘর আলো,
সীতার মতন।

সুকান্তর কবিতা। তার প্রায় শিশুকালের কবিতা বলা চলে। সদ্যস্ফুট কবি মনে তার দুই বোনকে নিয়ে লিখেছিলেন ছড়ার মতো করে কবিতাখানি।

কতইবা তখন আর বয়স? ছয় সাত বছর হয়তো খুব জোড়।

কিন্তু যারাই কবিতাটা পড়েছেন অবাক না হয়ে পারেননি। ঐটুকু বয়সে কি সুন্দর কবিতা, কি সুন্দর ছন্দজ্ঞান তাতে।

মুগ্ধ হয়েছিলেন বড়রাও।

সুকান্তর জ্যাঠামশাইও তার এই বালক ভ্রাতুষ্পুত্রের এহেন কাব্য প্রতিভায় স্তম্ভিত হয়েছিলেন সেদিন।

সুকান্ত কবি। এ গর্ব রাণীদিরও কম নয়। তিনি যে তাকে অপত্যস্নেহে বড় করে তুলছেন। ছড়া, কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে তো তিনিই সুকান্তর ভিতরে কবিত্বের বীজ প্রথম বপন করে দিয়েছিলেন।

না, গর্ব রাণীদি আর বেশী দিন করতে পারেননি।

অকালমৃত্যু রাণীদিকে গ্রাস করে নিয়ে গেল। বাড়ীর সবাই

শোকে দিশেহারা। আর কন্যার শোকে কৃষ্ণচন্দ্র প্রায় উন্মত্ত হয়ে উঠলেন। এক কথায় শোকাচ্ছন্ন হলো সারাবাড়ীখানাই।

কিন্তু সুকান্ত?

সুকান্ত ভাসলেন অথৈ জলে। তার প্রিয় রাণীদি চলে গেলেন তাকে ছেড়ে। শিশু সুকান্ত কি সেদিন বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি আর তার রাণীদির কোমল স্পর্শ বাকী জীবনে পাবেন না?

সম্ভবত পেরেছিলেন।

তাই তো দেখা যেতো সুকান্তকে শোকে মুহ্যমান। তার মনও যেন পাগল হয়ে উঠতো। তবু সারা বাড়ীর আনাচে-কানাচে শুধু ঘুরে বেড়াতেন রাণীদির সন্ধানের জন্য। তার একটু কোমল হাতের স্নেহের স্পর্শের জন্য।

সে কি অসহায় অবস্থা!

কিন্তু অবুঝ অবস্থায় বালক সুকান্ত কি করে জানবেন, যে যায় সে আর ফিরে আসে না কোনদিন।

আশ্চর্য!

অবুঝ বালক মন যেন কিছুতেই শান্তি পায় না। স্বস্তি পায় না। শুধু তার প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে চায়। নয়তো তাকে কে দেবে শান্ত্বনা! কে পূরণ করবে এই অভাব!

ধীরে ধীরে একদিন হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন সবই।

আর বড়রা?

তাদের নতুন বাড়ীর সমস্ত মোহ কেটে গেল চিরদিনের মতো। সকলেরই ধারণা হলো মনে, এই বাড়ীটাই অমঙ্গলে। নয়তো এমন সুন্দর, সুস্থ, হাসি-খুশিময় মেয়েটি এমনি হঠাৎ সবাইকে শোকসাগরে ভাসিয়ে পালিয়ে যাবে কেন?

এর কিছুদিন পরে সুকান্তর জ্যাঠতুতো বড়দা অর্থাৎ বাড়ীর সবার বড়ছেলে গোপাল ভট্টাচার্যেরও মৃত্যু হয় সুতরাং বাড়ী বদলের ব্যবস্থা পাকাপাকি ভাবেই হলো।

কৃষ্ণচন্দ্র বেলেঘাটার বসবাস তুলে চলে গেলেন হুগলী জেলার উত্তরপাড়ায়। আর সুকান্তর বাবা তার সংসার তুলে নিয়ে এলেন কলেজস্ট্রীটে। ভাড়া নিলেন একটা সাধারণ বাড়ী।

পৃথক হলো একান্নবর্তী পরিবার।

কিন্তু মনের দিক দিয়ে পৃথক হয়নি কেউ।

সুতরাং গৃহান্তর হলেও মনান্তর যেহেতু হয়নি, সুকান্ত বেশী সময় তার জ্যাঠতুতো ভাইদের ওখানেই থাকতেন।

সুকান্তর বড়বৌদি সরযূদেবীর কাছেই হয়েছিলো তার পড়াশুনোয় হাতেখড়ি। অক্ষর পরিচয় তিনিই করান। মৌখিক ভাবে অবশ্য সে জ্ঞান হয়েছিলো রাণীদির কাছে।

ছোটবেলায় সুকান্ত নিজে পড়া থেকে অপরে পড়ে শোনালে বেশী খুশী হতেন।

রাণীদির আবৃত্তি সুরের কবিতাগুলো তখনও সুকান্তর মন থেকে সরে যায়নি। কাজেই সেই অভ্যাসটা থেকে গিয়েছিলো বেশ কিছুদিন।

বড়বৌদির তত্বাবধানে তখনও ভাল ভাবে পড়তে শেখেননি সুকান্ত। অতএব তাকে আব্দার করে বলতেন, বৌদি, তুমি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়, আমি শুনবো।

সুকান্ত বড় আদরের ছিলো তার কাছে।

সুতরাং তার কোন আব্দার তিনি ঠেলে সরিয়ে দিতে পারতেন না কখনও।

কাজেই সুকান্তর আব্দার অনুযায়ী তাকে পড়ে শোনাতে হতো। বালক সুকান্তর উপযোগী ছড়ার বই সংগ্রহ করতে হতো তাকে। আর রোজ সে সব নিত্য নতুন ছড়া শোনাতেন তিনি।

শিশু অবস্থা থেকেই সুকান্তর স্মৃতিশক্তি ছিলো খুব প্রখর।

বৌদি মুখে মুখে ছড়া বলে যেতেন আর বালক সুকান্ত সে সব শুনে শুনেই মুখস্ত করে ফেলতেন। পরে আবার সুকান্ত সে ছড়াগুলো বাড়ীর অন্যান্যকে কত মজা করে আবৃত্তির ভঙ্গিতে শোনাতেন।

সুকান্ত ছিলো ভীষণ অভিমানী।

একবার বৌদিকে অসময়ে ছড়া পড়ে শোনাতে আব্দার করায় বৌদি বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, আমি সব সময় পড়ে শোনাতে পারবো না। তুই নিজে পড়তে শেখ্ সুকান্ত।

এইটুকু কথা।

ব্যাস্, সুকান্তর সে কি অভিমান! এই এক কথাই তার আত্মসম্মানে খুব লেগেছিলো। অভিমান করে ক'দিন আর বৌদির কাছেই ঘেষ্‌লেন না! দূরে দূরে ঘুরে বেড়াতেন শুধু।

সুকান্তর মাথায় চুল অবিন্যস্ত। সর্বসময়ই মুখখানা ভার ভার করে থাকতেন। কেমন যেন একটা উদাস ভাব।

মায়া হতো বৌদির।

না, নিজেকে তখন আর তিনি ঠেকিয়ে রাখতে পারতেন না। বেদনায় ভেঙ্গে পড়তেন। আদর করে ডেকে নিতেন সুকান্তকে তার কাছে। তাকে ছাড়া যে তার এক মুহূর্তও চলতো না। সুকান্ত ছিলেন তার অনেক আদরের।

ঐ সময় সুকান্তদের বাড়ীর প্রায় নিকটেই থাকতেন একজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। নাম ছিলো অহিনবাবু। এই অহিন-বাবুর কিন্তু সুকান্তদের বাড়ীর সাথে খুবই ভাব ছিলো। বিশেষ হৃদ্যতারফলেই দুই পরিবারে যাওয়া আসা ছিলো তার।

একদিন ভোরবেলা অহিনবাবু এলেন সুকান্তদের বাড়ীতে। সুকান্তর বাবার সঙ্গে গল্প করছেন তিনি। হঠাৎই নিবারণবাবু অনুরোধ জানালেন তাঁকে, তাঁর ছেলে দু'টোকে কোন স্কুলে ভর্তি করে দিতে।

অনুরোধ ঠেলতে পারেননি।

সুতরাং এক শুভ-মুহূর্তে অহিনবাবু সুকান্ত ও তার ছোটভাইটিকে সঙ্গে নিয়ে চললেন স্কুলে ভর্তি করে দিতে।

যথাসময়ে ভর্তি হলেন সুকান্ত ও তার ছোটভাই দু'জনেই।

প্রাথমিক বিদ্যালয়। নাম, 'কমলা বিদ্যামন্দির'।

এবার শুরু হলো বিদ্যালয়-জীবন। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের। ধরা-বাঁধা জীবন। নতুন ছকে এগিয়ে চললো দিন।

অত্যন্ত শান্ত এবং লাজুক প্রকৃতির ছিলেন সুকান্ত। কিছুটা আপনভোলাও বটে।

প্রথম প্রথম নিজেকে ঠিক মতো স্কুলজীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়ায়ে চলতে পারছিলেন না তিনি। এই নতুন জীবনকে তাই তার কাছে বড়ই বিদ্‌ঘুটে ঠেকছিলো।

সুকান্ত যখন প্রথমে স্কুলে ভর্তি হলেন, তখন প্রায়ই তিনি বই ও শ্লেট নিয়ে খালিগা'য়েই স্কুলে চলে যেতেন। ভুলে যেতেন জামা পরার কথা। এমনই খেয়ালী প্রকৃতির ছিলেন তিনি।

প্রথমটায় খুব মজাই করতেন সুকান্ত।

সুকান্ত স্কুলে গিয়ে 'প্রথম ভাগের' ছবির পাতাগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে ক্লাশের ছেলেদের বিলিয়ে দিতেন। তারপর টিফিনের ঘণ্টা বাজলেই ছেঁড়া বই আর শ্লেট নিয়ে সোজা চলে আসতেন বাড়ীতে।

রান্নাঘরের দোরের কাছে এগিয়ে এসে বই শ্লেট ছুড়ে ফেলে দিয়ে চেঁচিয়ে বলতেন, বৌদি, ক্ষিধে পেয়েছে। কি আছে দাও।

সুকান্তকে খাবার দিয়ে বইপত্তর গুছিয়ে রাখতে গিয়ে বৌদির চোখে পড়তো, বই ছেঁড়া আর তাতে অনেকগুলো পাতাও নেই। তাই অবাক হয়ে তিনি জিজ্ঞেস করতেন, কিরে সুকান্ত, তোর বইয়ের পাতা সব কি হলো?

তৎক্ষণাৎ গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিতেন সুকান্ত, জানিনা যাও—

কিন্তু এই অভ্যাস বরাবর ছিলো না।

কিছুদিন পরে কিন্তু এই ত্রুটি তার দূর হয়ে গিয়েছিলো। এই

লাজুক আর বুদ্ধিমান বালক এক সময় খুব সহজেই শিক্ষকদের প্রিয় হয়ে উঠলেন। জয় করে নিলেন তাদের মন পর্যন্ত।

সুকান্ত ?

অল্প সময়ের মধ্যে সুকান্তও কিন্তু তার শিক্ষকদের কাছ থেকে প্রভূত আদর পেয়ে গেলেন। কারণ শিক্ষকগণ তার ঐ শান্তশিষ্ট প্রকৃতি এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচয় লাভ করে খুবই খুশী হয়েছিলেন।

এদিকে সুকান্ত তার শিক্ষক মশায়দের নিকট হতে স্নেহ ও উৎসাহ পেয়ে বেশ আনন্দের সঙ্গেই নিজের পড়াশুনার উন্নতি করে চলেছেন। বিদ্যালয় জীবনের পরিবেশটা তখন অনেকটা তার ধাতে এসে গেল।

জীবনের প্রথম থেকেই সুকান্তর মাতৃ-ভাষার প্রতি দারুণ আসক্তি পরিলক্ষিত হয়। কারণ বাংলা ভাষা সহজ ও সুন্দর ভাবে তিনি ছোটবেলা থেকেই লিখতে এবং বলতে পারতেন। এত অল্প বয়সে বাংলা ভাষার উপর এমন দখল দেখে শিক্ষকমশায়রাও অবাক হয়ে যেতেন।

কমলা বিদ্যা-মন্দিরে যখন সুকান্ত এসে প্রথম ভর্তি হন তখনই তার সঙ্গে পরিচয় হয় শৈলেন সরকারের। তিনি ছিলেন সুকান্তর সহপাঠী। ক্রমশ এই পরিচয় বন্ধুত্বে পরিণতি লাভ করে। শৈলেন সরকারও সুকান্তকে খুব অল্প সময়ের মধ্যে ভালবেসে ফেললেন। মনযোগ সহকারে দুজনেই তাদের পাঠ এগিয়ে নিয়ে চললেন।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করছি পরবর্তী জীবনে 'আমার বন্ধু সুকান্ত' নামে স্মৃতিকথায় শৈলেন সরকার লিখেছেন—

'কমলা বিদ্যা মন্দিরের একেবারে নীচের শ্রেণী থেকে সুকান্তর সাহচর্য লাভের সুযোগ আমার হয়েছিলো। তখনকার দিনে স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ছিল অল্প। বোধহয় কুড়ি জনের বেশী ছাত্র আমরা এক ক্লাশে ছিলাম না। তারই মধ্যে ঐ লাজুক, আপাত স্বল্পবাক ছেলেটাকে সহজেই নজরে পড়তো তার বুদ্ধিদীপ্ত চেহারার জন্য।

ধীরতা নম্রতা ও বন্ধু-প্রীতি ছিলো সুকান্তর সহজাত গুণ। বাইরে

থেকে দেখে মনে হতো সুকান্ত কথা বলে কম। কিন্তু মেলামেশা করলে বোঝা যেতো ও সে ধাতের ছেলেই নয়; কল্পনার নবীনতায়, বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যে ও লঘু পরিহাস-প্রিয়তায় ওর সঙ্গ সর্বদাই আনন্দময় করে তুলতো।

বয়সের তুলনায় সুকান্ত যে আমাদের থেকে অনেক এগিয়ে গেছে সেটা আমরা সে সময়েই বুঝতে পারতাম। স্কুলের ভালো ছেলেদের সে ছিলো একজন। কিন্তু অন্য সকলের তুলনায় তার পড়াশুনা ছিলো অনেক বেশী, যা সে সময়ে আমরা ভাবতেও পারতাম না। ক্লাশে ভাল রচনা লিখতে পারার প্রশংসা সুকান্ত একাই কুড়াতো। এ জন্য মাষ্টার মশাইরা ওকে বিশেষ স্নেহ করতেন। আমরাও সপ্রশংস দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে থাকতাম।'

প্রাইমারী স্কুলের ছাত্র তখন সুকান্ত।

বয়স কতইবা আর তখন। সবে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ে। তার মন যেন তখন থেকেই গোটা বিশ্বকে জানতে চায়। ইতিহাস কিংবা ভূগোল পড়ে কতটুকু আর জানা সম্ভব!

না, জানা সম্ভব নয়। বোঝা সম্ভব নয়। জানতে অথবা বুঝতে হলে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রয়োজন। সে কি করে সম্ভব। সে পরিস্থিতি কোথায়? না, সম্ভব নয় মোটেই। একথা সুকান্ত ঐ বয়সে খুব ভাল করেই বুঝতে পেরেছিলেন।

কিন্তু সুকান্তর জ্ঞান পিপাসু মন চঞ্চল হয়ে উঠে।

জ্ঞান আহরণ প্রত্যক্ষভাবে অসম্ভব বুঝেই তিনি মন ঘুরিয়ে নিলেন বিভিন্ন বইয়ের দিকে। সুকান্তর শিশুমন তখন থেকেই পৃথিবীর প্রায় সমস্ত বড় বড় লেখকদের লেখা পড়ে নিজের মনের জ্ঞান পিপাসাকে নিবৃত্ত করতে চেয়েছেন।

ঐ সময় থেকেই সুকান্তকে সাহিত্যানুরাগী হিসাবে আমরা দেখতে পাই। তখনই তার প্রাণে এসেছিলো উন্মাদনা। চোখের তারায় ফুটে উঠেছিলো এক নতুন পরিকল্পনার ছবি।

না, দেরী করেননি সুকান্ত। তিনি একবার যা করবেন স্থির করতেন, সে যে ভাবেই হোক শেষ তিনি করতেনই।

সুতরাং এই নতুন পরিকল্পনার কথা তিনি ক্লাশে তার সহপাঠীদের জানালেন। বললেন, যদি আমরা সবাই মিলে একটা হাতে লেখা পত্রিকা বার করি তবে কেমন হয়?

শুনে খুশী হলেন অনেকেই। রাজীও হলেন সবাই।

অতএব পরিকল্পনা মতো কাজ আরম্ভ হয়ে গেল। উৎসাহের সঙ্গে এগিয়ে চললেন সকলে।

যথাসময়ে কিনে আনা হলো লাইনটানা ভাল কাগজ আর যুৎসই চাইনিজ ইংক। সুন্দর করে লেখা হলো তাতে। এক সময় হাতে লেখা পত্রিকা বার হলো। পত্রিকাটির নামকরণ করা হয়েছিলো 'সঞ্চয়'। সুকান্তই পত্রিকার নাম দিয়েছিলেন। সেদিন তাদের ক্লাশের সহপাঠীদের আন্তরিক সাহায্যে এবং সুকান্তর সম্পাদনায় পত্রিকাটি খুবই সুন্দর হয়েছিলো। আর এই হাতে লেখা পত্রিকায় প্রথম রচনাটিই ছিলো সুকান্তর। সত্যি, ভারী সুন্দর হয়েছিলো সে রচনাটি। হাস্য-রস যুক্ত একটি ছোটগল্প।

আশ্চর্য!

হাঁা, আশ্চর্য হবারই কথা। এইটুকু ছেলের এমন স্বচ্ছ লেখা এলো কোত্থেকে! কোত্থেকে এলো এমন শক্তি! স্কুলের ছাত্র, শিক্ষক সবাই মুগ্ধ।

না, সুন্দর রচনার জন্য সেদিন স্কুলের ছাত্র শিক্ষক কেউ তাকে প্রশংসা না করে থাকতে পারেননি। আর তখন থেকেই তিনি শিক্ষক মশায়দের খুই প্রিয় হয়ে উঠলেন।

ঐ চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ার সময়ই আরেকবার সুকান্ত মুগ্ধ করেছিলেন সবাইকে। সেবার কিন্তু লেখায় নয়।

সরস্বতী পূজা হচ্ছে স্কুলে। সেবারের পূজায় শিক্ষকমশায়রা

স্থির করলেন পূজার দিন ছেলেদের একটি একাঙ্ক নাটক বিদ্যালয় চত্বরে মঞ্চস্থ করাবেন।

ঠিক করা হলো নাটকের নাম 'ধ্রুব'। অতএব বিলম্ব নয়, নাটকের কাজ এগিয়ে চললো শিক্ষকমশায়দের উৎসাহে। না, প্রস্তুতি পর্বের কোন ত্রুটি রইলো না।

সরস্বতী পূজার দিন।

দিনের বেলা ধুমধাম করে পূজা হয়ে গেল। সন্ধ্যার পরে নাটক। মঞ্চ তৈরী। লোকজনও বেশ জড়ো হতে লাগলো।

যথাসময়ে 'ধ্রুব' নাটক মঞ্চস্থ হলো। ছাত্রদের অভিনয় ভাল হয়েছে। কিন্তু অবাক করেছেন সুকান্ত। নাটকের নাম ভূমিকায় তিনি এমন সুন্দর আর হৃদয়গ্রাহী অভিনয় করেছেন যা সকলেরই উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছিলো। আর শিক্ষকমশায়রা তো সুকান্তর এমন সুন্দর অভিনয়ের জন্য বিস্ময়ে হতবাক !

প্রত্যেক কাজেই সুকান্তর ছিলো এমনি গভীর নিষ্ঠা। এই নিষ্ঠাই ধীরে ধীরে তাকে কিশোর জীবনে এত বড় করেছিলো।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ। এবার হাই স্কুলে ভর্তি হবেন সুকান্ত। বাড়ীর লোকেরা তাকে বেলেঘাটা দেশবন্ধু হাই স্কুলে ভর্তি করে দেন।

দেশবন্ধু স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হলেন সুকান্ত।

নতুন স্কুল। নতুন পরিবেশ। এই নতুন ছাত্র এবং শিক্ষকদের মাঝখানে যেন সুকান্তর বালক মন হাঁফিয়ে উঠলো। স্বল্পভাষী এবং লাজুক প্রকৃতির সুকান্ত প্রথম প্রথম সহপাঠীদের ও শিক্ষক মশায়দের চালচলন প্রভৃতি লক্ষ্য করলেন। পরে অবশ্য তার অপ্রকৃতিস্থ মন ক্রমশঃ প্রকৃতিস্থ হয়ে এলো।

সুকান্ত তার সহপাঠীদের মাঝখান থেকে খুঁজে নিলেন একটি

ছেলেকে। বড় মিষ্টি স্বভাবের ছেলেটি। বড় সুন্দর তার কথাবার্তা। সুকান্ত খুশী হলেন খুব।

খুশী হলেন অরুণাচল বসু। তিনিও সুকান্তকে কাছে টেনে নিলেন। আলাপ পরিচয়ের মাধ্যমে তারা দু'জনে ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন নিকটে। বন্ধুত্বে।

শুধু কি বন্ধুত্ব?

আরো বেশী! অনেক বেশী। সুকান্ত আর অরুণাচলের বন্ধুত্ব যেন মণি-কাঞ্চনের সংযোগ। বড় মধুর সে সম্পর্ক।

না, এ সম্পর্ক কোনদিন মলিন হয়নি। ফাটল ধরেনি। তাদের বন্ধুত্বের সুদৃঢ় বন্ধন যে মধুময়। সুতরাং আজীবন তা অটুট ছিলো। কোন ঘটনাতেই তাদের এই সম্পর্ককে বিন্দুমাত্র চিড় ধরাতে পারেনি। এ যে দু'টি প্রাণবন্ত কবিসত্তা। পরবর্তী জীবনে তাইতো খ্যাতিমান কবি হিসাবে আমরা অরুণাচল বসুকে দেখতে পাই।

সুকান্তর প্রতিভার পরিচয় প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকেই অনেকে পেয়েছেন। ছাত্ররা এবং শিক্ষকেরা সবাই মুগ্ধ হয়েছেন অনেকবার।

এরপর দেশবন্ধু স্কুলে পড়ার সময়ও তার প্রতিভার পরিচয় পেয়েছেন অনেকে। ইতিহাসের এক শিক্ষক মশায় তো তার প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাকে নিজের বুকেই টেনে নিয়ে গেলেন। তারপর থেকে তাকে কবিতা লেখায় নানাভাবে সাহায্য করতেন তিনি।

প্রায়ই সেই শিক্ষকমশায় সুকান্তকে তার নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতেন। কিশোরচিত্তকে বিভিন্ন কবির কাব্যালোচনার দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট করবার জন্য তিনি কত কবিতার ব্যাখ্যা করে শোনাতেন সুকান্তকে।

কত সময় সুকান্তকে সংগ্রহ করে দিতেন কত দুষ্প্রাপ্য দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত বই। সে সব বই কবি জীবনে সুকান্তকে প্রভূত সাহায্য করেছিলো। বাংলা সংস্কৃত তো বটেই, এমন কি বিদেশের সাহিত্যেও।

এই শিক্ষক মশায়ের সস্নেহের ফলেই সুকান্তর কিশোর-চিত্তে স্থান তৈরী করেছিলেন সেক্সপীয়ার, ব্রাউনিং আর শেলির মতো বড় বড় কবিরা।

সুকান্তও খুব উৎসাহ পেতেন তাতে।

কত সময় এ সব ইংরেজী সাহিত্যকে বাংলায় এমন সুন্দরভাবে অনুবাদ করে শোনাতেন যে, সুকান্ত পরম বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে সে সব শুনতেন।

ক্রমে পরিস্থিতি এমন হলো, পরপর যদি দু-তিন দিন সুকান্ত সেই শিক্ষকের বাড়ীতে না যেতেন, তবে তিনি ছুটে আসতেন তার খোঁজে।

আর সুকান্ত?

কিশোর সুকান্তও একটু সুযোগ পেলেই ছুটে গিয়ে হাজির হতেন শিক্ষকমশায়ের কাছে। তার জ্ঞানভাণ্ডার থেকে কিঞ্চিত জ্ঞান আহরণের প্রচণ্ড তৃষ্ণায় বুঝি তিনি অস্থির হয়ে উঠতেন।

ছাত্র ও শিক্ষকের প্রীতির বন্ধন এমন এক পর্যায়ে এসে দাঁড়ায় ক্রমশঃ। তাদের দুজনের আলোচনার এমন স্বচ্ছগতি যে, মনে হয় তারা যেন দুই বন্ধু।

কিন্তু সুকান্ত তো খুব কৃতি ছাত্র ছিলেন না। স্কুল জীবনে তো সে পরিচয়ই পাওয়া যায় বরাবর। না হোক কৃতি ছাত্র, তবু তো তার ভিতর খুঁজে পেয়েছিলেন অনন্য সাধারণ কবি প্রতিভা।

কি ভাবে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন কবির প্রতিভাকে? তাও এক মজার ঘটনা।

ছোটবেলা থেকেই প্রচণ্ড জ্ঞান পিপাসা ছিলো সুকান্তর। স্কুলে কিংবা বাড়ীতে যেখানেই সময় পেতেন সেখানেই তিনি মনযোগ সহকারে নানা ধরণের বই পড়তেন। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ, তারাশঙ্কর, মনীন্দ্রলাল বসু, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তর লেখা পেলেই পড়তেন। এ ছাড়াও বিভিন্ন কবি সাহিত্যিকের লেখাও

যথেষ্ট পড়তেন। এমন কি তার পড়ার আওতা থেকে বুক অফ্ নলেজ কিংবা জ্যোতিষী বিজ্ঞান প্রভৃতি বইও বাদ যেতো না।

ক্লাশে দুই বন্ধু সুকান্ত আর অরুণাচল বসতেন একই বেঞ্চে, পাশাপাশি। দু'জনে ক্লাশে বসে যখন শিক্ষক থাকতেন না সে সময়ে গল্প করতেন। কখনও বা কাব্য নিয়ে আলোচনা করতেন। কোন কোন দিনবা সুকান্ত বই পড়ায় এত মেতে যেতেন যে সেদিন আর কোন কথাই বলতেন না।

একদিন ক্লাশে বসে সুকান্ত বই পড়ছিলেন। একটা বাংলা গল্পের বই। বইয়ের ভিতর এত ডুবে গিয়েছিলেন যে কোন কিছু তার খেয়াল ছিলো না। গভীর ভাবে পড়ে যাচ্ছেন।

সম্ভবত ক্লাশটা ছিলো টিফিনের পরেই।

ইতিহাসের ক্লাশ।

ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষকমশায় এসে ঢুকলেন ক্লাশে। বড় গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন তিনি। ক্লাশে এসেই ইতিহাস খুলে তিনি পড়াতে শুরু করলেন। তারপর ছাত্রদের একে একে প্রশ্ন ধরতে লাগলেন তিনি।

একসময় সুকান্তকে একটি প্রশ্ন করলেন শিক্ষকমশায়।

কিন্তু কোথায় সুকান্ত? তিনি তখন বইয়ের মধ্যে ডুবে রয়েছেন। সুতরাং শিক্ষকমশায়ের প্রশ্ন তার কানেই গেল না। তিনি নির্বিবাদে তখনও মাথাগুজে বই পড়ে চলেছেন।

বিস্মিত শিক্ষকমশায়।

আবার প্রশ্ন করলেন সুকান্তকে।

না, এবারও সুকান্ত একই ভাবে বই পড়ে চলেছেন।

শিক্ষকমশায়ের মুখ এবার আরও গম্ভীর হয়ে উঠলো।

কোনরকমে শিক্ষকমশায়ের দৃষ্টি এড়িয়ে অরুণাচল একটা খোঁচা দিলেন সুকান্তকে। তৎক্ষণাৎ সুকান্ত মুখ তুলে ঠিক হয়ে বসলেন।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন শিক্ষকমশায়। আবার জিজ্ঞেস করলেন, কি বই পড়ছিলে তুমি এতক্ষণ?

নীরব সুকান্ত।

তাকে নির্বাক দেখে এবার আরও উত্তেজিত হয়ে গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি জিজ্ঞেস করেছি তোমায়?

সুকান্ত নির্বাক।

এবারও তাকে চুপ করে থাকতে দেখে প্রচণ্ডভাবে রেগে উঠলেন শিক্ষকমশায়। অদ্ভুত উত্তেজনায় অস্থির হয়ে গেলেন যেন!

ক্লাশসুদ্ধ ছেলে যেন ভয়ে মূক হয়ে গেল।

পাশেরই একটি ছেলে সভয়ে উঠে দাঁড়ালো। বললে, স্যার, কানে বড্ড কম শোনে সুকান্ত। প্রায় একরকম শুনতেই পায় না।

কিন্তু এতেও রাগ কমলো না শিক্ষকমশায়ের।

ক্রোধের সঙ্গেই গর্জে উঠলেন তিনি, স্ট্যাণ্ড আপ অন দি বেঞ্চ।

সুকান্ত মাথা নত করে বেঞ্চের উপর উঠে দাঁড়ালেন।

শিক্ষকমশায় এবার একটু শান্ত গলায় শুধালেন, ক্লাশের পড়া তৈরী না করে গল্পের বই পড় কেন?

নিজের ভুলের জন্য এবার লজ্জায় মাথা নত হলো আরও। মুখ তুলতে পারলেন না সুকান্ত। জবাব দিতে পারলেন না কিছুই।

পাশের ছেলেটি আবার বলে উঠলো, ও এসব বই প্রচুর পড়ে স্যার, কবিতা লেখে কিনা।

শিক্ষকমশায় কিছুটা বিদ্রূপের সঙ্গে হেসে উঠলেন। বললেন, কি বললে তুমি? ও কবিতা লেখে? কবি?

আবার হেসে উঠলেন শিক্ষকমশায়।

ছেলেটি আবার জানালে, আপনি পড়েননি স্যার, তাই। এবারের স্কুল ম্যাগাজিনটা দেখবেন। তাতেই সুকান্তর কবিতা আছে।

শিক্ষকমশায়ের চোখে মুখে তখনও যেন কেমন একটা বিস্ময়!

এক সময় ঘণ্টা বেজে উঠলো।

শিক্ষকমশায় ক্লাশ থেকে বেরিয়ে গেলেন। ছাত্ররা যেন কিছুটা গুমট্ পরিস্থিতি থেকে অব্যাহতি পেল এতক্ষণে।

দেখতে দেখতে আরও একটা ক্লাশ শেষ হয়ে গেল।

হঠাৎ দপ্তরি এসে সুকান্তকে টিচার্স রুমে যেতে বললো। সুকান্তর সহপাঠীরা অবাক বনলেন। এবার জানি কি হয়! নির্ঘাৎ ইতিহাসের জের উঠবে।

আশঙ্কায় অস্থির হয়ে উঠলো সবাই।

কিন্তু সুকান্ত?

না, কোন শঙ্কা নেই। কি হবে মিছে ভাবনা ভেবে। অন্যায় তো তিনি করেছেনই। ক্লাশে পড়া ফাঁকি দিয়ে অন্য বই পড়াতো কোন মতেই উচিত নয়। সুতরাং যা হবার তাই হবে।

তবু সন্ত্রস্ত মনে সুকান্ত এগিয়ে চলেছেন টিচার্স-রুমের দিকে।

কি করবে সুকান্ত! তার যে ভাল লাগে না ইতিহাস। কি হবে দুই হাজার বছরের আগেকার রাজার কথা জেনে? কিংবা তার শাসন-পদ্ধতি জেনে? না, এসব তার মাথায় একদম ঢুকতে চায় না।

তবু তাকে স্কুলে আসতে হয়। সে তো শুধু বাড়ীর অভিবাবকদের মনতুষ্টির জন্য। এসব যেন তার কাছে একেবারেই অসহ।

সত্যি অসহ্য লাগে সুকান্তর কাছে।

ভেবে পায় না সুকান্ত, নীরস অঙ্ক আর বীজগণিতের বইয়ের ভেতর কি করে রস পেতে পারেন?

না, অসম্ভব।

ক্লাশের বেঞ্চে বসে সুকান্তর মন চলে যায় দূরে-বহুদূরে। স্কুল-বাড়ীর সীমানা অতিক্রম করে এক বৃহত্তর গণ্ডির মধ্যে। যেখানে বিরাট পৃথিবী। সীমাহীন তার পরিধি। সেই বিরাটত্বের মধ্যে সুকান্ত যেন ডুবে যেতে চায়। মিলিয়ে যেতে চায়। মিশে যেতে চায় একান্তভাবে।

এক সময় সুকান্ত এসে উপস্থিত হলেন টিচার্স রুমের দরজার কাছে।

ভীত সন্ত্রস্ত মন। ছলছল্ চোখ। অজানা এক আশঙ্কায় বুক তার দুরুদুরু করে কাঁপছে যেন।

আর একটু এগোলেন সুকান্ত।

ডেকেছেন স্যার?

হ্যাঁ, ভিতরে এসো।

ভিতরে ঢুকে গেলেন সুকান্ত। এবার গিয়ে দাঁড়ালেন একেবারে শিক্ষকমশায়ের কাছাকাছি।

শিক্ষকমশায় তাকিয়ে রইলেন পলকহীন দৃষ্টি নিয়ে। কি এক অদ্ভুত সে দৃষ্টি। যেন সুকান্তর সর্বশরীরকে পরম বিস্ময়ে নিরিক্ষণ করে চলেছেন তিনি।

সুকান্তও নির্বিকার। নির্বাক।

কয়েকটি মুহূর্ত।

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন শিক্ষকমশায়। তার শক্ত সবল দু'বাহু দিয়ে তিনি টেনে নিলেন সুকান্তকে। একেবারে বুকে। সস্নেহে বললেন, সুকান্ত, তোর কবিতা পড়লাম আমি। তোর ভেতর যে এত প্রতিভা লুকিয়ে আছে তা এতদিন আমি খোঁজ পাইনি। তুই বড় হবি। খুব বড় কবি হবি। দেশ জুড়ে একদিন তোর নাম ছড়িয়ে পড়বে।

সুকান্ত পায়ের ধুলো নিলেন শিক্ষকের।

বাধা দিতে গিয়ে বললেন, থাক্ থাক্, এমনিতেই তোকে আশীর্বাদ করছি। সুকান্ত তুই মস্ত বড় কবি হ'। তবে আমার আজকের ব্যবহারের জন্য ক্ষমা করিস আমায়।

এমনি এক নাটকীয় দৃশ্যের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না সুকান্ত।

এক সময় সুকান্ত ফিরে আসতে সবাই অবাক।

চোখে তার জল কোথায়? বরং চোখে মুখে যে হাসির প্রচ্ছন্ন দীপ্তি ছড়িয়ে রয়েছে!

ক্লাশসুদ্ধ ছেলে ঘিরে ধরলো, কি ব্যাপার রে সুকান্ত?

হাসলো সুকান্ত।

ছেলেরা আরও অবাক হয়।

টিচার্স-রুমের সমস্ত ঘটনা খুলে জানালেন সুকান্ত। সব শুনে ছেলেরাও খুশীতে উপ্‌চে পড়লো।

সুকান্তর কবি প্রতিভার পরিচয় পেয়েছিলেন আরেকজন শিক্ষক। নাম—নবদ্বীপচন্দ্র দেবনাথ। তখন সুকান্ত সপ্তম শ্রেণীতে পড়েন।

তিনি তার এক প্রবন্ধে পরবর্তী জীবনে লিখেছেন—

'ক্লাশে ছেলেদের লেখা প্রবন্ধ সংশোধন করছি। পেছনের বেঞ্চের একটি ছেলের খাতায় চোখ বুলানো মাত্রই চমকে উঠলাম। কী সুন্দর ভাষা আর অপূর্ব ভাব! অনন্য সাধারণ, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রচনা! হাতের লেখাটিও চমৎকার, যেন রবীন্দ্রনাথের লেখা! মুগ্ধ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লাম।'

সত্যি, অভিভূত হয়েছিলেন তিনি। সেদিন থেকে সুকান্ত তার সব থেকে প্রিয় ছাত্র হয়েছিলেন। তিনি যে তার অদ্ভুত ছন্দ-জ্ঞানের পরিচয় পেয়েছিলেন। তাইতো তাকে বরাবর তিনি কবিতা লেখার জন্য উৎসাহ দিয়েছেন।

হ্যাঁ, ছন্দজ্ঞান। আরও ছন্দজ্ঞান চাই সুকান্তর। তাই শিক্ষক নবদ্বীপবাবু আরও বিভিন্ন প্রকার ছন্দজ্ঞানের জন্য সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যালোচনার দিকেও তার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। প্রভূত উৎসাহ জুগিয়েছেন। সুকান্তর সঙ্গে বন্ধুর মতো মিশে গিয়েছিলেন।

তার ক্লাশের কয়েকজন ভালো ছাত্রকে নিয়ে এই শিক্ষকমশায় একটি হাতে লেখা পত্রিকা বার করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনিই সেই পত্রিকার নামকরণ করলেন 'সপ্তমিকা'।

উদ্দেশ্য, ঐ সব ছাত্রদের মধ্যে সাহিত্যে প্রতিযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলা। প্রেরণা সঞ্চার করা।

শিক্ষক নবদ্বীপ বাবুই স্থির করলেন, সম্পাদক হিসাবে থাকবেন সুকান্ত। আর সহযোগী সম্পাদক করলেন বর্তমানে কবি অরুণাচল বসুকে। নিজে দায়িত্ব নিলেন পরিচালনার।

নবদ্বীপবাবু নিজেও একজন কবি।

সুতরাং কবি মানসে অন্য কবির জন্য কি অপরিসীম দরদ! কি অদ্ভুত স্নেহ!

বালক হৃদয়ে কাব্যালোচনার অনবদ্য রস-পিপাসাকে উজ্জিবিত করে তোলার জন্যই এই 'সপ্তমিকা'র সৃষ্টি। এই হাতে লেখা পত্রিকা খানি প্রকাশিত হবার পর তিনি মন্তব্য করেছিলেন—'সপ্তমিকায় সুকান্ত যে সম্পাদকীয় লিখেছিলো তা হয়েছিলো উচ্চমানের যে কোন প্রথম শ্রেণীর সম্পাদকীয় ভাষণের মতোই।'

'সপ্তমিকা'য় যে কবিতা লিখেছিলেন সুকান্ত সেটা ও খুব হৃদয়গ্রাহী হয়েছিলো। ছাত্র শিক্ষক সবাই বেশ সুখ্যাতি করেছিলেন। আর অরুণাচল নিজে ও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন সুকান্তর কবিতায়।

আর নবদ্বীপবাবু?

তিনি উৎসাহ দিতেন। জোগাতেন প্রেরণা। বলতেন, চমৎকার হয়েছে। আরও লেখ। অনেক লেখ। তবেই তো একজন দেশ বিখ্যাত কবি হবে।

সত্যি, স্বার্থক হয়েছিলো নবদ্বীপবাবুর সেদিনকার ভবিষ্যৎবাণী।

বেলেঘাটা দেশবন্ধু স্কুলে ভর্তি হওয়ার কিছুদিন পরেই সুকান্ত তার সহপাঠী অরুণাচলকে খুঁজে নিয়েছিলেন বন্ধুরূপে। আর তাদের সেই হৃদ্যতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে শুরু হলো ক্রমশ। শুধু স্কুলের গণ্ডিতেই সেই বন্ধুত্ব থেমে যায়নি। এই প্রগাঢ় বন্ধুত্বের পরিব্যাপ্তি

ঘটেছিলো স্কুলের বাইরেও। এমন কি একে অপরের বাড়ীতে পর্যন্ত যেতেন।

প্রথম যেদিন সুকান্ত অরুণাচলের বাড়ীতে যান সে দিনটি ছিলো অরুণাচলের জন্মদিন।

ছোটখাট একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে।

সুকান্তর নিমন্ত্রণ রয়েছে। কিন্তু লাজুক প্রকৃতির ছেলে সুকান্ত। তাই প্রথমটায় আম্‌তা আম্‌তা করে পরে রাজী না হয়ে পারেননি।

যথাসময়ে গিয়ে হাজির হলেন সুকান্ত।

খুব খুশী হলেন অরুণাচল। সুকান্তকে নিয়ে সোজা গেলেন মার কাছে। পরিচয় করিয়ে দিলেন তার সঙ্গে।

অরুণাচলের মা সরলাদেবী ছিলেন একজন সুলেখিকা। আবার বেলেঘাটা গার্লস-স্কুলের শিক্ষয়িত্রীও ছিলেন তিনি।

সুকান্তকে কাছে বসিয়ে খেতে দিলেন। তারপর নানান রকম প্রশ্ন করলেন তিনি তাকে।

আশ্চর্য হলেন সরলাদেবী।

সুকান্ত কোন কথারই জবাব দিচ্ছেন না। মাথা নীচু করে নীরবে শুধু খেয়ে যাচ্ছেন। এ কি রকম!

মনে মনে বিরক্ত হলেন সরলাদেবী।

সাধারণ ভদ্রতাটুকুও জানে না। এ কেমন ব্যবহার! আদব-কায়দাগুলো কিছুই কি শেখেনি নাকি!

উৎসব শেষ হল এক সময়।

সবাই চলে গেলেন। বিদায় নিয়ে চলে গেলেন সুকান্তও।

এরপর প্রায়ই আসতেন সুকান্ত। অরুণাচলের সঙ্গে গল্প করতেন অনেকক্ষণ। কিন্তু সরলাদেবীর কোন উৎসাহ ছিলো না তাতে। তাকে প্রায় সময়ই দেখা যেতো ওদের গল্পে তিনি উদাসীন থাকতেন।

অরুণাচল লক্ষ্য করতেন সব।

প্রায়ই মায়ের এ হেন ঔদাসিন্য লক্ষ্য করে একদিন অরুণাচল বললেন, মা, সুকান্ত বড় দুঃখী। ওর মা নেই এ সংসারে। তার উপর এত ভাল ছেলে কিন্তু কি অভিশাপ তার, কানেও ভীষণ কম শোনে।

অরুণাচল জানতেন ওখানেই তার মায়ের দুর্বলতা। যদি তার মা জানতে পারেন কারো মা নেই তবে তাকে তিনি বড় স্নেহ করেন। নিজের ছেলের মতো সমান করে দেখেন।

ছেলের কথা শুনেও সরলাদেবী তুষ্ট হননি।

আরও কিছুদিন পরের কথা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘটনা। মহানগরীর মানুষ তখন ভয়ে সন্ত্রস্ত। কি হয় কি হয় একটা ভাব। বোমা পড়বার ভয়ে তখন শহর ছেড়ে লোক পালাচ্ছে।

সরলা দেবীও অরুণাচলকে রেখে এলেন দেশের বাড়ীতে।

কিন্তু বিপদ দেখা দিলো একটা।

স্কুল আর কতটুকু সময়। বাকী সময়টুকু পার হবে কি করে! সময় যে আর কাটতে চায় না। নিঃসঙ্গ সময়ে হঠাৎ সুকান্তকে তার খুব বেশী করে মনে পড়লো।

সঙ্গে সঙ্গেই সুকান্তকে দেখা করতে খবর পাঠালেন।

সংবাদ পেয়ে এসে হাজির হলেন সুকান্ত।

সরলা দেবী জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছ সুকান্ত?

সুকান্ত নীরবে বসে আছেন, কোন উত্তর দিলেন না।

সরলা দেবীর তখন মনে পড়লো অরুণাচলের কথা। সে তো বলেছিলো সুকান্ত কানে কম শোনে। তাই আবার বেশ জোরেই প্রশ্ন করলেন, কেমন আছ সুকান্ত?

—ভাল আছি। আপনি? অরুণ ভালো আছে তো?

এবার বুঝতে পারলেন সরলাদেবী, সুকান্ত কেন প্রথম দিনের

প্রশ্নের উত্তর দেয়নি। এবার সত্যি তার করুণা হলো সুকান্তর জন্য। সেদিন অনেকক্ষণ বসে বসে দুজনে গল্প করলেন।

এরপর থেকে প্রায় রোজই আসতেন সুকান্ত। সরলাদেবীর নিঃসঙ্গ সময়কে সঙ্গ দিয়ে বিভিন্ন আলোচনায় ভরিয়ে তুলতেন। ঐ দৃশ্য দেখলে কে বলবেন যে ওরা মা আর ছেলে নয়। এখানেই তো সুকান্ত সরলা দেবীর মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন তার হারিয়ে যাওয়া মাকে।

সুকান্তর আত্মসম্মান বোধ ছোটবেলা থেকেই কতটা প্রখর ছিলো সে সম্বন্ধে একটা ঘটনার অবতারণা করছি।

সুকান্তর মামার বাড়ী ছিলো কালিঘাটে।

একদিন সুকান্তর বাবা তাকে আর তার ছোট ভাইটিকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছিলেন কালিঘাটে। সুকান্তর মামার বাড়িতে।

বাসে উঠলেন।

তখন কিন্তু বাসে আইন ছিলো মাত্র একজন যাত্রী একটি শিশুকে নিয়ে যেতে পারবেন বিনা ভাড়ায়। কারো সঙ্গে দু'টি শিশু হলে একজনের ভাড়া লাগবে।

বাস চলছে।

একসময় কণ্ডাক্টর ভাড়া চাইলেন।

সুকান্তর বাবা একটি টিকিটের পয়সা দিলেন।

কণ্ডাক্টর কিন্তু তৎক্ষণাৎ তার পাশের দু'টি শিশুর দিকে তাকিয়ে বললেন, ওরা দু'জন কি আপনার সঙ্গে ?

হ্যাঁ।

তবে আর একটা টিকিটের পয়সা দিন।

সুকান্তর বাবা উত্তরে সুকান্তকে দেখিয়ে বললেন, মনে করনা বাপু, আমার ঐ ছেলেটি অন্য একজন যাত্রীর সঙ্গে যাচ্ছে।

সুকান্ত কিন্তু তাজ্জব বনে গেলেন।

তার চোখে মুখে ফুটে উঠলো এক অসহ্য ভাব। ছিঃ ছিঃ পয়সার জন্য এ অপমান। না, নিয়ম লঙ্ঘন তিনি করবেন না।

করুণা ? কণ্ডাক্টরের ? না অসম্ভব !

পরের ষ্টপেজে এসে বাস দাঁড়ালো।

সঙ্গে সঙ্গে সুকান্ত বাস থেকে নেমে গেলেন। তারপর বাসের ঠিক উল্টোমুখে হাঁটতে লাগলেন তিনি।

তখনও কিন্তু সুকান্তর কান আর মুখ লজ্জায় লাল হয়েছিলো। মনে মনে তখনও তোলপাড় করছে বাসের ঘটনাটা।

কতই বা বয়স আর তখন সুকান্তর। বড় জোর সাত কিংবা আট হবে।

আশ্চর্য ! ঐটুকু বয়সে কি অদ্ভুত সম্মান-বোধ ছিলো সুকান্তর।

সুকান্ত ভীষণ রসিক ছিলেন। তার রসিকতার কিছু কিছু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

মাত্র আট কিংবা নয় বছরের বালক সুকান্ত।

একদিন তার এক নিরীহ বৌদির সঙ্গে রসিকতা করতে গিয়ে একেবারে তাঁকে কাঁদিয়ে ফেলেছিলেন।

তখন একান্নবর্তী পরিবার সুকান্তদের।

সুকান্তরা কয়েক ভাই এবং তাদের এক সমবয়স্ক মামা সবাই তখন বাড়ীতে।

যথাসময়ে রান্নাঘরের বারান্দায় বসে খেতে বসলেন সবাই। সেদিন ঐ নিরীহ বৌদির উপর পড়েছিলো পরিবেশনের দায়িত্ব।

বৌদি খেতে দিলেন সবাইকে।

সুকান্তর মাথায় সহসা একটা দুর্বুদ্ধি এলো। সঙ্গে সঙ্গে সবাই যুক্তি করে স্থির করে নিলেন।

কি যুক্তি? হাঁড়ির ভাত নিঃশেষ করতে হবে। বৌদিকে জব্দ করতে হবে। কি মজা!

সুতরাং আর কোন কথা নয়।

সবাই জোরালো সমর্থন জানালেন সুকান্তকে।

মুহূর্তের মধ্যে সবাই গম্ভীর হয়ে গেলেন।

বৌদি যাকে যতটুকু প্রয়োজন সেই মতো ভাত তরকারী প্রভৃতি দিয়ে নিজের ঘরে এলেন। তখন তার শিশু সন্তান খুবই কাঁদছিলো।

সুকান্ত সর্বপ্রথম চেঁচিয়ে ডাকলেন, বৌদি ভাত দাও।

বৌদি ফিরে এসে ভাত দিয়ে আবার ঘরে গেলেন ক্রন্দনরত ছেলের জন্য। আবার আরেকজন চীৎকার করে উঠলেন, বৌদি ভাত লাগবে।

আবার ফিরে এসে ভাত দিয়ে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে আরেকজন বললেন, ভাত চাই বৌদি।

আবার ছুটে এলেন বৌদি।

তখন সবাই একসঙ্গে চীৎকার শুরু করলেন, আমায় ভাত দাও। আমায় ভাত দাও।

সবাইকে ভাত দিতে দিতে মুহূর্তের মধ্যে দেখা গেল হাঁড়ি একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে।

বৌদি নিরুপায় দেখে ছুটে গেলেন ঘরে। তার শিশু ছেলেটি তখনও কাঁদছে। রাগে অভিমানে তিনি তৎক্ষণাৎ ঐ শিশুটির উপর চালালেন এক-ঘা চড়। আর নিজেও সঙ্গে সঙ্গে কেঁদে ফেললেন।

বারান্দায় তখনও তারস্বরে সমানে চীৎকার চলেছে, ভাত দাও বৌদি। ভাত লাগবে।

বৌদি কিন্তু আর ফিরে এলেন না।

কিন্তু বারান্দায় তখনও গণ্ডগোল চলছে। ভাত চাই বলে গ্রাস পেটানোও চলছে সমানে।

গণ্ডগোল শুনে ছুটে এলেন সুকান্তর মা।

পরিস্থিতি দেখে অবস্থাটা বুঝতে পারলেন। ধমকে উঠিয়ে দিলেন সবাইকে।

দেওরদের রসিকতায় সেদিন বৌদিটি কিন্তু দারুনভাবে নাজেহাল হয়েছিলেন।

যেমন রসিক সুকান্ত, তেমনি মজার মজার ছড়াও লিখতেন তিনি। আর সে সব রসিকতাগুলো বন্ধুমহলে খুবই সমাদ্রিত হতো।

সুকান্তর বয়স তখন দশ হবে।

বেলেঘাটায় সে সময় নিয়মিত কবিতা লেখেন। কত মজার মজার সে সব কবিতা। আর লেখার পর সেগুলো সবাইকে পড়ে শোনাতেন। বন্ধুদের কাছ থেকেও প্রচুর প্রশংসা লাভ করতেন তিনি।

কখনও বা লিখেছেন—

তোমরা আমায় নিন্দে ক'রে দাওনা যতই গালি,
আমি কিন্তু মাখছি আমার গালেতে চুন-কালি,
কোন কাজটাই পারি নাকো বলতে পারি ছড়া,
পাশের পড়া পড়ি না ছাই পড়ি ফেলের পড়া····

কখনও—

বল দেখি জমিদারের কোন্‌টি ধাম ?
জমিদারের দুই ছেলে রাম ও শ্যাম।
রাম বড় ভাল ছেলে পাঠশালায় যায় ,
শ্যাম শুধু ঘরে বসে দুধ ভাত খায়।···

আবার—

ও পাড়ার শ্যাম রায়
কাছে পেলে কামড়ায়
এমনি সে পালোয়ান,
একদিন দুপুরে
ডেকে বলে গুপুরে
এক্ষুনি আলো আন।···

রসিকতার এক অদ্ভুত পদ্ধতি সুকান্ত রেখে গেছেন তার এক কবিতায়। সুকান্তকে যারা গম্ভীর বা লাজুক বলে জানেন, তারা এই কবিতায় তার এক নতুন ছবি দেখতে পাবেন।

মেয়েদের পদবী নিয়ে লেখা গোটা কবিতাটি একদিকে যেমন রসিকতার নিদর্শন, অপরদিকে ছন্দেরও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

কয়েকটি লাইন—

মেয়েদের পদবীতে গোলমাল ভারী,
অনেকের নামে তাই দেখি বাড়াবাড়ি;
'আ'কার অন্ত দিয়ে মহিলা করার
চেষ্টা হাসির। তাই ভূমিকা ছড়ার।
'গুপ্ত' 'গুপ্তা' হয় মেয়েদের নামে,
দেখেছি অনেক চিঠি, পোষ্টকার্ড, খামে।
সে নিয়মে যদি আজ 'ঘোষ' হয় 'ঘোষা'
তা'হলে অনেক মেয়ে করবেই গোঁসা,
'পালিত' 'পালিতা' হলে 'পাল' হলে 'পালা'
নির্ঘাৎ বাড়বেই মেয়েদের জ্বালা,…

এ ধরনের অনেক কবিতা সুকান্ত লিখেছেন ঐ বয়সে। সকলের কাছেই তিনি বাহবা পেয়েছেন। পাড়াতে, স্কুলে সর্বত্র।

একদিন বন্ধু অরুণাচল বললেন, সুকান্ত, তুই খেলাধুলো বড় একটা করতে চাস না। কেন বলতো?

সুকান্ত গম্ভীর ভাবে বললেন, ও সব ভাল লাগে না তাই।

অরুণাচল হাসলেন। বললেন, আসলে রস পাস না।

ঠোঁট উলটিয়ে জবাব দিলেন সুকান্ত, হবে।

দাবা খেলবি? শেখাবো তোকে। দেখবি খুব মজার খেলা। দারুণ ইন্টারেষ্টিং।

কেন জানি শেখার জন্য সুকান্ত রাজি হয়ে গেলেন।

অরুণাচল মুখে মুখে খেলার নিয়মকানুন সব বলে দিলেন। তারপর শুরু হলো প্রকৃত খেলা।

এদিকে অরুণাচল পেলেন শিক্ষাদানের এক অপূর্ব সুযোগ। না, এ সুযোগকে কোন মতেই হাতছাড়া করা যায় না। আর সুকান্তকে কোনমতে একবার শেখাতে পারলে আর পায় কে। দুই বন্ধুতে সময় কাটাবার একটা সুন্দর পথও হবে।

ঘটলো এক মজার ঘটনা।

খেলা চলছে। দু'জনেই গুটির চাল দিচ্ছেন সমানে। একসময় সুকান্তর দাবার চাল দেওয়া দেখে চোখ স্থির হয়ে গেল অরুণাচলের।

যতই খেলা এগুচ্ছে অরুণাচলের ততই যেন অবাক হবার পালা! শেষে চালে অরুণাচলকে এমন বেকায়দায় ফেললেন সুকান্ত যে তার পক্ষে হার স্বীকার না করে থাকার আর কোন পথ খোলা ছিলো না।

সুকান্তকে খেলা শেখাতে গিয়ে এমনি নাজেহাল হবেন জানলে কি অরুণাচল খেলা শেখাতে রাজি হতেন!

আরেকবার সুকান্ত তার বন্ধু অরুণাচলকে ভীষণ বোকা করে দিয়েছিলেন।

অরুণাচল ছোটবেলা থেকেই গ্রাম্য জীবনে অভ্যস্ত। গ্রামের সব কিছুর সঙ্গেই খাপ খাইয়ে চলতে পারেন তিনি।

কিন্তু সুকান্ত?

না। তিনি গাঁয়ের ছেলে নন। বলতে গেলে গ্রামের কোন কিছুর সঙ্গেই নিজেকে ঠিক ঠিক খাপ খাওয়াতে পারবেন না। আসলে বাংলার কোন পল্লীর সঙ্গেই তিনি বিশেষ পরিচিত নন।

সাঁতার জানা প্রত্যেক মানুষেরই প্রয়োজন।

সুতরাং জানতে হবে সুকান্তকেও। অরুণাচল মনের কথা খুলে জানালেন তাকে।

কিন্তু রাজি হন না সুকান্ত।

মহা সমস্যা দেখা দিলো এই নিয়ে।

সুকান্ত যতই অরাজি হন, অরুণাচল ততই জোর করেন। বললেন, শোন সুকান্ত, প্রত্যেক মানুষেরই সাঁতার জানা দরকার। তুই তো বিপ্লবী। তোর তো বিশেষ প্রয়োজন। নইলে বিপ্লবী জীবনে অনেক সময় অনেক বিপদে পড়তে হয়।

তবু সুকান্ত রাজি হন না জলে নামতে।

কি আর করেন অরুণাচল।

হঠাৎ মাথায় এলো এক দুর্বুদ্ধি। অরুণাচল জোর করে হাত ধরে টানতে টানতে জলে নিয়ে নামালেন।

সুকান্ত করুণ চোখে বললেন, অরুণ, আমায় ছেড়ে দে ভাই। নইলে জলে ডুবে যাব আমি।

অরুণাচল নাছোরবান্দা। বললেন, ডুবে যাবি কেন? আমি তো রয়েছি।

না না, ছেড়ে দে।

সুকান্তকে টেনে ততক্ষণে বুক জল পর্যন্ত নামিয়েছেন অরুণাচল। তিনি সুকান্তকে সাঁতার শেখাবেনই।

সুকান্ত ও সমানে বলে চলেছেন, ছেড়ে দে অরুণ, যা জানি না তা করতে গেলে যে বিপদ হতে পারে। তুই যা চাইছিস্। আমি তা পাড়বো না।

অরুণাচলের ও সমান জিদ। বললেন, তোর ভয় নেই সুকান্ত আমি তো আছি। আর একদিনেই তো সাঁতার শেখা হবে না। অল্প জলে নেমে একবার চেষ্টা করে দেখই না।

সুকান্ত চুপ করে যায়।

বুঝতে পারেন সুকান্ত, অরুণাচলের হাত থেকে কোন মতেই আজ নিস্তার নেই। তবু ভয়ে ভয়ে বললেন, দেখিস ভাই, ডুবে যন না যাই।

সাঁতার শেখাচ্ছেন অরুণাচল হাত ধরে ধরে।

হঠাৎ এক কাণ্ড ঘটে গেল।

সুকান্তর তৈলসিক্ত হাত হঠাৎ ছুটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে জলে তলিয়ে গেলেন সুকান্ত।

মুহূর্তের মধ্যে অরুণাচলের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

একি হলো!

জলের নীচে আশে-পাশে চারিদিক হাতড়ে খুঁজতে লাগলেন অরুণাচল। কিন্তু কোথায় সুকান্ত!

এবার চোখে জল এসে গেল অরুণাচলের।

ভয়ে বুক কাঁপতে লাগলো। একসময় কেঁদে ফেললেন তিনি। কান্নার স্বরেই বললেন, সুকান্ত তোকে শেষ পর্যন্ত জলে এনে বিসর্জন দিলাম। কেন তোর কথা শুনলাম না। কেন জোর করে সাঁতার শেখাতে গেলাম। কি হবে এখন!

অরুণাচল তখন প্রায় উন্মাদ হয়ে গেছেন।

মুহূ মুহূ জলে ডুব দিয়ে খুঁজতে খুঁজতে তার চোখ ছুটি লাল জবার মতো হয়ে গেছে তখন।

এমনি করে কেটে গেল দু'তিন মিনিট।

এদিকে সুকান্ত পুকুরের অপর পারে গিয়ে ততক্ষণে হাজির। ডুব দিয়েই চলে গেছেন তিনি। আবার চিৎ সাঁতার দিয়ে ফিরতে ফিরতে চীৎকার করে বলছেন, তুই ভাল সাঁতার শেখাতে পারিস তো অরুণ! দেখ, আমি একদিনেই কেমন সুন্দর সাঁতার শিখে গেছি। তোকে বাহবা না দিয়ে পারছি না। সত্যি, তোর সাঁতার শেখানোতে বাহাদুরি আছে। নইলে এমন সাঁতার শিখলাম কি করে?

অরুণাচলের অবস্থা তখন কল্পনাতীত।

কান্না থেমে গেছে। না, আর কোন দুশ্চিন্তা নেই সুকান্তর জন্য। তবে রাগে দুঃখে ততক্ষণে যেন অরুণাচল বোবা হয়ে গেছেন। শুধু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে সুকান্তর দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি।

এর কিছুদিন পরের ঘটনা।

একদিন অরুণাচল নিজের ঘরে মশারী টানিয়ে নিদ্রায় মগ্ন। রাত অনেক হয়েছে তখন। প্রায় তিনটে বাজে।

সে রাতে সুকান্ত মজা করতে লোভ সামলাতে পারলেন না। তিনি সোজা চলে এলেন অরুণাচলের বাড়ীতে। ভয় দেখাবেন অরুণাচলকে।

অরুণাচল যে ঘরে ঘুমান সে ঘরের জানালায় শিকের অভাবে লোক চলাচলের বেশ প্রশস্থ পথ হয়ে গেছে। সেখানে এসে দাঁড়ালেন সুকান্ত।

পৃথিবী ক্লান্তিতে যেন নিদ্রায় বিভোর।

শুধু জেগে আছে আকাশে দ্বিতীয়ার ক্ষীণ চাঁদ। বুঝি বা রাত জেগে পাহারা দিচ্ছে গোটা বিশ্বকে। জানাচ্ছে অভয় বাণী।

এমনি পরিবেশে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায় অরুণাচলের। বুঝতে পারলেন, কে যেন তার মশারীর দড়ি ধরে টানাটানি করছে।

অবাক হন অরুণাচল। ব্যাপার কি ?

ছোটবেলা থেকেই দারুণ সাহসী ছিলেন অরুণাচল। ভয় বলে কোন বস্তু ছিলো না তার কাছে। ভূত! না, তার কোন অস্তিত্ব আছে বলে জানেন না তিনি। সুতরাং সে কল্পকাহিনী তার মনে স্থান পেল না।

তবে কি ?

চোর! না, চোরের ভয়ও তার ছিলোনা কোন দিন। সে ভয় থেকেও তিনি মুক্ত।

আশ্চর্য! তবে মশারীর দড়ি ধরে টানছে কে ?

তন্দ্রা-জড়ানো চোখ মেলে তাকালেন কোন মতে। তাকাতেই দেখতে পেলেন একটা কালো ছায়া মূর্তি।

প্রথমটা হকচকিয়ে গেলেন অরুণাচল।

মুহূর্তের জন্যই বুঝি।

না, বুঝতে অসুবিধা হলো না অরুণাচলের। এ ছায়া মূর্তি ভূত কিংবা চোরের নয়। নিশ্চয় খাবারের লোভে বানর এসেছে।

মনে মনে বিরক্ত হলেন অরুণাচল।

ধীরে ধীরে মশারীর ভিতর থেকে বেরিয়ে আসলেন তিনি। তারপর দরজার শক্ত মজবুত ডাঁসাটা হাতে নিয়ে একটু একটু করে এগিয়ে এলেন জানালার কাছে।

এক সময় ছায়া মূর্তির দেহে আঘাত করার জন্য তিনি তুলে ধরলেন হাতের শক্ত ডাঁসাটা। বললেন, দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজা। এই মুহূর্তেই তোকে দুনিয়া থেকে বিদায় করবো আজ।

সুকান্ত সেই সময় চীৎকার করে উঠলেন, আরে অরুণ, করছিস কি? দাঁড়া। আমি। আমি সুকান্ত।

চমকে উঠলেন অরুণাচল।

সুকান্ত! তুই! এত রাতে কি ব্যাপাররে?

নির্বাক সুকান্ত।

ভাগ্যিস্ কথা বলেছিলি! আরেকটু সময় চুপ করে থাকলেই কি একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটে যেতো বলতো?

সুকান্ত নির্বাক তখনও।

মনে মনে ভাবলেন, অরুণাচলকে জব্দ করতে এসে নিজেই কেমন জব্দ হয়ে গেলেন যেন। একেবারে বোকা হয়ে গেলেন।

অরুণাচল আবার প্রশ্ন করেন, কি রে, একেবারে চুপ করে রইলি কেন? কি ব্যাপার বল্না?

সুকান্ত হাসলেন ছোট্ট করে।

এমনি এসেছিলাম। কেন জানি ঘুম পাচ্ছিলো না। ভাবলাম, তোর এখানে এসে একটা মজা করবো। তোকে জব্দ করবো।

কারণ?

আবার সেই সরল স্বচ্ছ হাসির ঝলক চোখে মুখে। সহজ ভাবেই বললেন সুকান্ত, রোজ ভোরে ঘুম ভাঙ্গিয়ে বড় অস্থির করিস আমায়।

তাই ভাবলাম, আজ তারই ফল হিসাবে তোকে একটু শায়েস্তা করবো।

উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন অরুণাচল। সুকান্তকে বুকে চেপে ধরলেন তিনি। বললেন, তাই এই কষ্ট তোর!

সুকান্ত কোন জবাব দিলেন না। নিজের বোকামীতে নিজেই ধরা পড়ে গেলেন।

অরুণাচলের হাসিতে সুকান্তও হেসে উঠলেন উচ্চস্বরে।

দুই বন্ধুতে একে অপরকে জড়াজড়ি করে ধরলেন বুকে।

বড়দাদা মনমোহন ভট্টাচার্য ও বৌদি সরযূ দেবীর কাছে সুকান্তর আদর ও আব্দার ছিলো অপরিসীম। এই বৌদি ছিলেন সুকান্ত-অন্তঃপ্রাণ। তার কাছে সুকান্ত থাকতেন প্রায় সময়ই।

একদিন বৌদি রান্না ঘরে রান্নার কাজে খুবই ব্যস্ত ছিলেন।

হঠাৎ নামলো প্রচণ্ড বৃষ্টি।

উনানে তখন রান্না চাপানো। তার উপর যে রকম বৃষ্টির বেগ তাতে বড় ঘরে আসতে হলে তাকে পুরো ভিজে যেতে হবে। কিন্তু দরজা দিয়ে বৃষ্টির ছাঁট এসে এদিকে ঘর যে ভিজে যাচ্ছে।

সুকান্ত ঘরে ছিলেন। কিন্তু সে দিকে কোন খেয়াল ছিলো না।

অগত্যা বৌদি রান্নাঘর থেকে চেঁচিয়ে বললেন, সুকান্ত দরজাটা দে।

কিন্তু কোথায় সুকান্ত?

সুকান্ত তখন জানালার ফাঁক দিয়ে বর্ষার প্রকৃতির দৃশ্য দেখতে ব্যস্ত। কোন দিকে আর তার নজর নেই।

অনেকবার ডাকাডাকির পরও যখন সুকান্তর কোন সাড়া পেলেন না তখন তার ভারী রাগ হলো।

কি অবাক কাণ্ড। এদিকে বৃষ্টি ছাঁটে তখন প্রায় ঘর ভিজে যাচ্ছে। উপরন্তু ঘরে শুয়ে রয়েছে বাচ্চারা। বাতাসে ঠাণ্ডা লাগতে আর কতক্ষণ!

এবার তাই আরো জোরে চেঁচিয়ে বললেন, কথাটা কানে যাচ্ছে না সুকান্ত? বলছি দরজাটা দে।

শুনতে পেলেন এবার। কিন্তু বৌদিকে রাগাতে এক দুষ্টু বুদ্ধি খেলে গেল তার মাথায়।

দরজার কাছে এসে দরজাটা ধরে বার কয়েক টানাটানি করে নিরাশ হয়ে গেলেন।

হতাশ ভঙ্গিতে বললেন সুকান্ত, দুঃখিত বৌদি, তোমার কথা রাখতে পারলাম না। কারণ, দরজাটা তুমি চাইছ বটে, কিন্তু আমি যে দিতে পারছিনা। জান, ওটা ভীষণ ভারী।

সুকান্তর হাবভাব দেখে ও কথা শুনে বৌদির হাসি পাচ্ছিল। কোন রকমে সে ভাবটাকে চেপে আরও গম্ভীর হয়ে বললেন, দরজাটা বন্ধ কর।

সুকান্তরও মুখ গম্ভীর। সে ভাবেই জবাব দিলেন, সে কথা বলবে তো! ব্যাকরণ-শুদ্ধ করে না বললে কি কাণ্ড হয় দেখ। দরজা দিতে বলছো, সে কি দেওয়া যায় নাকি।

বৌদি বললেন, বাঁদর—

সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিলেন সুকান্ত, ঐ তো, তোমার আবার দিক ভুল হলো। ওটা বাঁ-দোর নয় বৌদি, ডান দোর।

এর পর কি আর হাসি চেপে রাখা যায়!

হেসে ফেললেন বৌদি।

সুকান্ত প্রায় সুযোগ পেলে এমনি রসিকতা করার লোভ কিছুতেই সামলাতে পারতেন না। এই ধরনের রসিকতা তিনি বহুক্ষেত্রে করেছেন।

ছোটবেলা থেকেই সুকান্ত ছিলেন ভাবুক প্রকৃতির।

আজ থেকে অনেকদিন আগে অর্থাৎ প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর আগের কথা।

হ্যাঁ, তখনই অনেকে দেখেছেন একটা সাধারণ ধূতি আর নীল রঙের জামা গায়ে সুকান্তকে রাস্তার ধার ঘেষে চলতে। কখনও শান্ত ধীর গতিতে আপনভোলা ঐ কিশোরকে মানিকতলা মেন রোড ধরে, আবার কখনও বা বেলেঘাটা মেন রোড ধরে যেতে দেখা গেছে।

প্রায় সময়ই লক্ষ্য করে দেখা গেছে, সুকান্ত যেন সর্ব-সময়ই বিশেষ একটা চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। মনে হবে বুঝি বা এই বিরাট পৃথিবীর সমস্ত চিন্তাধারা তার মাথায় এসে জড়ো হয়েছে। পথ চলতে যেন কষ্ট হচ্ছে খুব।

শীর্ণ দেহ।

না, তবু তার পথ চলার বিরাম নেই। রাস্তায় চলতে চলতে কত কি ভাবতে ভাবতে চলেন যেন।

আপনভোলা সুকান্ত কত সময় রাস্তায় যেতে যেতে ডান হাতের তর্জনী উঁচিয়ে বির্ বির্ করে কি যেন বলতেন। মনে হয়, দারুণ একটা চাপা ক্রোধে কাকে যেন তিনি ভীষণ ভাবে শাসাচ্ছেন। যেন কারো উপর ভীষণ চটেছেন তিনি।

আবার কত সময় দেখা গেছে আপন মনে পথ চলতে চলতে হেসে ফেলছেন।

এমনি আপনভোলা সুকান্ত

আশ্চর্য।

তবু সুকান্তকে পীড়া দিতো সংসারের নানা ঝামেলা এসে। তিনি সময় সময় বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেন সংসারের নানা ঝঞ্ঝাটের উপর।

অদ্ভুত এই সংসার জীবন।

এক ঘেয়েমি মাকুবৃত্তি যেন এখানে। সুকান্তর মন খুঁজে বেড়ায় শান্ত নিরিবিলি পরিবেশ। কিন্তু কোথায়?

এখানে তো কোন বৈচিত্র নেই।

এমনি কত নানা কারণে বিতৃষ্ণা জাগতো তার মনে। আর তখনই

স্নেহ-মায়া-মমতাহীন এই সংসার থেকে অনেক দূরে চলে যেতে ইচ্ছে হতো তার। কি হবে এখানে থেকে?

না, কোন লাভ নেই। স্বার্থপর পরিবেশ ভাল লাগতো না সুকান্তর কবি মনে। সুতরাং কোথাও পালিয়ে যেতে চাইতো তার মন।

কিন্তু কোথায় যাবেন তিনি?

হাঁপিয়ে উঠতেন সুকান্ত। যেখানেই হোক যাওয়া চলে অন্তত এই পরিবেশ ছেড়ে।

কি হবে এই দুঃখ করুণ আত্মনাদের পরিবেশে মাথা খুড়ে পড়ে থেকে। এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য সুকান্তর কবি মন যেন সহসা হাহাকার করে উঠে।

অচেনা অজানা এক দেশ।

সেই ভাল। সুকান্ত সেখানেই চলে যাবেন আপাতত। ওখানেই নিজেকে অকাতরে বিলিয়ে দিতে পারবেন সম্পূর্ণ অপরিচিতের মধ্যে।

একদিন সত্যি সত্যি মনস্থির করে ফেললেন সুকান্ত। নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবেন অনেক দূরে। যেখানে থাকবেন না পরিচিত কেউ।

কিন্তু এক সমস্যা দেখা দিলো তাতে।

পাড়ার রবীন যেতে চায় সুকান্তর সঙ্গে। সেও তার পিছু নিয়েছে সকলের অজ্ঞাতে।

সুকান্ত রবীনকে এড়িয়ে যেতে চান। কিন্তু রবীন নাছোরবান্দা। তারও একান্ত ইচ্ছা সুকান্তর সঙ্গে যায়।

সুকান্ত আর কি করেন?

প্রথমে অনেক ভাবে তাকে বোঝালেন তিনি। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। নিরুপায় সুকান্ত অবশেষে নানারকমের ভয় দেখাতে লাগলেন।

কাকস্য পরিবেদনা। কোন ফলই হলো না।

সে যে এর মধ্যে অনেকটা এগিয়ে গেছে। বাড়ীতে বাবার বাক্স থেকে সংগ্রহ করে নিয়েছে কিছু টাকা। সুতরাং কি করে ফিরে যাবে সে বাড়ীতে।

না, কোন পথ নেই। অগত্যা তাকে সঙ্গে নিতে হলো সুকান্তর। এক সঙ্গেই যাত্রা শুরু হলো তাদের।

অচেনা অজানা দেশ। হ্যাঁ, সেই অচেনা দেশ আর লোককে চিনবেন সুকান্ত। অজানাকে জানবেন নতুন উপলব্ধি দিয়ে। সে অনেক-অনেক দূরের দেশ।

হাওড়া স্টেশনে এসে হাজির হলেন দু'জনে।

এক সময় দূর পাল্লার একটা গাড়ির মধ্যে এসে বসলেন সুকান্ত। সঙ্গে সঙ্গে উঠে এলো রবীন।

দু'জনে এক কম্পার্টমেণ্টে সীটের উপর দেহ এলিয়ে বসে আছেন। যেন কত নিশ্চিন্ত। কত আনন্দ।

গার্ডের নির্দেশ পেয়ে দৈত্যের মতো ফোঁস্ ফোঁস্ করে এগিয়ে চললো গাড়ী।

অনাবিল এক আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন সুকান্ত। তার বহুদিনের আশা আজ বাস্তবে রূপ নিতে চলেছে। খুশীতে সমস্ত মন ভরে উঠেছে অচেনা অজানা দেশের কল্পনায়।

দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে গাড়ী।

সুকান্ত লক্ষ্য করছেন গভীর মন দিয়ে, কত বাড়ী-ঘর, বন-জঙ্গল, মাঠ-প্রান্তর পিছনে ফেলে এগিয়ে চলেছেন তিনি। দু'ধারে সোনালী ফসলের ক্ষেত। হিল্লোলে নুয়ে নুয়ে যাচ্ছে মুহু মুহু। ওরা যেন মাথা নত করে নতুন অতিথিকে স্বাগত জানাতে চাইছে।

দূরে দূরে মাঠ। সেখানে রাখাল ছেলেরা শীর্ণকায় গরু নিয়ে আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আবার কেউ কেউ খেলায় মেতে গেছে। কেউ বা বাড়ী থেকে আনা কোন খাবার খাচ্ছে নীরালায় গাছের

নীচে বসে। আবার গোধূলি বেলায় যখন সূর্য ডুবে যায় আকাশের গা ছোঁয়ে বনের পিছনে তখন তাদের ঘরে ফেরার পালা।

গাড়ী চলছে দুলে দুলে।

উদাস দৃষ্টি মেলে সুকান্ত তাকিয়ে আছেন বাইরের দিকে।

মনে হয়, আরও কি যেন খুঁজে নিতে চান সুকান্ত। কত গভীর দৃষ্টি তার দু'চোখ জুড়ে। মনের তৃপ্তি যেন হয় না তবু।

ভালই লাগছিলো সুকান্তর কাছে। এক নাগাড়ে শহুরে জীবন যেন এক ঘেয়েমি হয়ে গেছে। এ এক নতুন স্বাদ। নতুন জিনিষ।

এক সময় দু'জনেই গাড়ী পাল্টালেন।

আসানসোল স্টেশন।

এখানেই নতুন গাড়ীতে উঠবেন আবার। কিন্তু রাত্রিটা যে কাটাতে হবে স্টেশনে! ভোরে ট্রেন।

অগ্রহায়ণ মাস।

দুর্দান্ত শীত পড়েছে। তার উপর আবার কনকনে হাওয়া বইছে। শীতে হাড়গুলো পর্যন্ত জমে যাবার উপক্রম।

নিরুপায় দু'জনে।

সুতরাং আশ্রয় নিতে হলো স্টেশনে জড়ো করে রাখা পোস্টাল ডিপার্টমেন্টের কতগুলো কাঠের বাক্সের ফাঁকে। বিছানা-পত্র কিছুই নেই সঙ্গে। এমন কি গরম জামা পর্যন্ত নেই কারো গায়ে।

জড়োসরো হয়ে শীতে কাঁপতে কাঁপতে এক সময় দু'জনের চোখেই ক্লান্তিতে তন্দ্রা নেমে এলো।

রাত তখন গভীর।

হঠাৎ লাঠির গুতো খেয়ে দু'জনেই লাফিয়ে উঠলেন। দেখলেন, সামনে দাঁড়িয়ে রেলের পুলিশ। হিন্দিতে বলছে, এখানে শোবার জায়গা নেই। চলে যাও।

কোন উপায় নেই। স্টেশনের বাইরে চলে গেলেন দু'জনে।

বসে বসে বাকী রাতটুকু পার হলো বটে কিন্তু সমস্যা দেখা দিলো রবীনকে নিয়ে।

একদিকে শীতে কঁাপছে, অন্যদিকে কান্না শুরু করেছে বাড়ী ফেরার জন্য। দেশ ভ্রমণের সমস্ত মোহ তার ঘুচে গেছে একটি রাত্রিতেই।

না, আর কোন আনন্দ নেই রবীনের মনে। নেই কোন উৎসাহ। শুধু এক কথা, বাড়ী ফিরে চল।

কান্না আর থামে না।

সুকান্ত মহাবিপদে পড়লেন। যদি রবীনের কান্না থামে এই আশায় নিজের গায়ের ঐ একটি মাত্র সূতির জামা তাও খুলে তার গায়ে চাপিয়ে দিলেন।

রাত কাটলো কোন রকমে। ভোর হলো। রোদও উঠলো। কিন্তু রবীন কিছুতেই তার বায়না ভুলতে পারলো না।

অগত্যা সুকান্তকে বাড়ী ফেরার জন্যই মনস্থির করতে হলো।

আবার হাওড়ার গাড়ী ধরলেন দু'জনে।

দেহ ক্লান্ত। পকেটে পয়সা নেই। কিন্তু খিদেয় তখন পেট জ্বলে যাবার উপক্রম হয়ে এসেছে প্রায়। কি আর করবেন? সুতরাং বিনে পয়সায় স্টেশনের জল খেয়ে ফিরে এলেন হাওড়াতে। গাড়ী থেকে নেমে রবীন পায়ে হেঁটে বাড়ী চলে গেল।

কিন্তু সুকান্ত?

সুকান্ত বাড়ী যাবেন কি করে? তার বাড়ী যাবার সমস্যা যে অন্যরকম। সবাই জানে, সুকান্ত পালিয়ে গেছেন। অতএব তার দোষ যে বেশী। তিনি যে বড় অপরাধী।

প্রথমেই মনে পড়লো বন্ধু অরুণাচলের কথা। হ্যাঁ, সেই ভাল। ওখানেই চলে এলেন সুকান্ত।

তখন দুপুর বেলা। প্রায় আড়াইটের মতো হবে। অরুণাচল এবং বাড়ীর অন্যান্যদের মধ্যাহ্ন ভোজন তখন শেষ হয়ে গেছে।

সুকান্তর চোখ মুখ এবং শরীরের হাল দেখেই অরুণাচল বুঝতে পারলেন সব। একটা যে কুকীর্তি সুকান্ত করেছেন এতে ভুল নেই।

ভাতের হাড়ি শূন্য। এখন উপায়?

অরুণাচল মুহূর্তে স্থির করে নিলেন সব। সঙ্গে সঙ্গেই ছুটলেন দোকানে। নিয়ে এলেন দই, কলা আর চিঁড়ে। বন্ধুকে খাওয়ালেন পেট ভরে।

পরে সুকান্ত সব কথা তার আবাল্যবন্ধু অরুণাচলকে বললেন। সব শুনে অরুণাচলও চিন্তিত। তাই তো বাড়ীর লোকদের কি বলা যায়?

দুই বন্ধু মিলে বিস্তর সময় পার করে সিদ্ধান্তে এলেন যে, বাড়ী ফিরে বলবেন সুকান্ত শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন। সুকান্ত কবি একথা বাড়ীর সবাই জানেন। সুতরাং এক কবি বিশ্ববরেণ্য কবির সান্নিধ্য লাভের আকাঙ্খায় গিয়েছিলেন এতো স্বাভাবিক কথা। আর এতে বাড়ীতে সুকান্তকে নিয়ে অশান্তি হবার ভয়ও থাকবে না।

উপায় খুঁজে পেয়ে দু'জনেই খুশী হলেন।

সুকান্ত চললেন বাড়ীতে। সঙ্গে অরুণাচল। হ্যাঁ, তিনিই এই ব্যাপারটা বাড়ীর লোকদের মধ্যে মধ্যস্থতা করে দেবেন।

দুই বন্ধুতে এলেন বাড়ীতে।

ভিতরে ঢুকেই দেখেন সুকান্তর দাদা সুশীল ভট্টাচার্য অসুস্থ অবস্থায় শুয়ে আছেন। পায়ে তার সেপ্‌টিক হয়েছে। বাড়ীতে লোকজন অনেক। তার উপর ডাক্তার এসেছেন দাদাকে দেখতে।

অনেকক্ষণ নীরবে বসে রইলেন দুই বন্ধু। সুকান্ত মাথা নীচু করে রইলেন অনেকক্ষণ পর্যন্ত। এই সবকিছুর জন্যই নিজেকে দোষী ভাবছেন।

নীরব রয়েছেন সবাই। কারো মুখে কোন কথা নেই।

অসহ্য এই নীরবতা।

অরুণাচলই প্রথমে নীরবতা ভঙ্গ করলেন। সবাইকে বুঝাতে চেষ্টা

করলেন, শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন সুকান্ত। তার কবি মন তাকে টেনেছিলেন বিশ্ব কবির সান্নিধ্যের জন্য। তাই শান্তিনিকেতনে হঠাৎ তিনি চলে গিয়েছিলেন।

সুকান্ত কবি একথা বাড়ীর সকলেই জানেন। অতএব তার কবি মন তাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলো রবীন্দ্রনাথের সাধের শান্তিনিকেতনে। এতে আশ্চর্যের কি আছে! খুব স্বাভাবিক।

সুতরাং তিরস্কারের কোন প্রশ্ন রইলো না আর।

খুব সহজেই সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। আর দুইজনে সেই আনন্দে উল্লাসিত হয়ে উঠলেন।

বাড়ী ফেরার কয়েকদিন পরও কিন্তু সুকান্ত ভুলতে পারেন নি রেল কম্পার্টমেণ্টের জানালার ফ্রেম থেকে দেখা প্রাকৃতিক দৃশ্যকে। ভুলতে পারেননি মাঠে গরু চরানো সেই রাখাল ছেলেগুলোকে। যারা নদীর তীরে, আবার কখনও বা ধূ-ধূ করা মাঠে আপন মনে বাঁশিতে সুর তুলতো।

অনাহারক্লিষ্ট রাখাল ছেলে আর তাদের শীর্ণকায় গরুগুলো দেখতে দেখতে কবির যেন মনে হয়েছিলো, ওরা যেন প্রকৃতির-ই একটি অঙ্গ মাত্র? বুঝি এরই প্রতিফলন দেখা যায় রাখালছেলে গীতি-নাট্যে।

একদিন দোয়েল পাখী তাকে ডেকে বলে—

(গান) ও ভাই রাখাল ছেলে
এমন সুরের সোনা বল কোথায় পেলে?...
তোমার বাঁশির সুর যেনগো নির্ঝরিনী,
তাই শোনে রোজ পিছন হতে বন-হরিণী।

রাখাল ছেলে অবাক হয়ে দেখে সত্যি এক দুষ্টু হরিণী…
সে তাকে বললে—

(গান) ওগো বনের হরিণী
তুমি রইলে কেন দূরে দূরে,
বিভোর হয়ে বাঁশির সুরে
আমি তো কাছে এসে বসতে তোমায় নিষেধ করিনি।

রোজই সেই হরিণী রাখাল ছেলের পাশে এসে শুনতে থাকলো তার বাঁশি। কিন্তু মা হরিণী বারবার নিষেধ করলো অবোধ শিশুকে। কেননা সে তার অভিজ্ঞতায় জানে মানুষ কী নিষ্ঠুর জীব! হরিণ-শিশু মা-র বারণ শুনলো না।…

মা হরিণী বললে—

ওরা সব দুষ্টু মানুষ মন ভুলাবে মিষ্টি হেসে
বুঝিবা ফাঁদ পেতেছে ওরা তোকে একলা পেয়ে!

কিন্তু হরিণ শিশু সরল মনে বললে—

না গো মা, ভয় করো না
সে তো মানুষ নয়,
সে যে গো রাখাল ছেলে,
আমি তার কাছে গেলে
বড্ড খুশি হয়॥

এক শিকারী এসে তার নিষ্ঠুর হাতে রাখাল ছেলের বাঁশির সুরে আবিষ্ট সেই হরিণ শিশুকে হত্যা করলো।…

সে তখন রাখাল ছেলেকে মিনতি করে বললে—

(গান) বাঁশি তোমার বাজাও বন্ধু
আমার মরণ কালে…

সাথীকে হারিয়ে রাখাল ছেলে অসীম দুঃখ পেল।

সে তখন কেঁদে বললে—

বিদায় দাওগো বনের পাখী,
বিদায় নদীর ধার
সাথীকে হারিয়ে আমার
বাঁচা হলো ভার।...

বনের পাখী, নদীর ধার সবাই তাকে মিনতি করলো।...

(গান) যেয়ো নাকো রাখাল ছেলে
আমাদের কে ছেড়ে
তুমি গেলে বনের হাসি
মরণ নেবে কেড়ে...

দূর থেকে রাখাল ছেলে বলে গেল—

ডেকো নাকো তোমরা আমায়
চলে যাবার বেলা,
রাখাল ছেলে খেলবে না আর
মরণ বাঁশির খেলা।

সুকান্ত তার অল্প পরিসর জীবনে মাত্র কয়েকটি গীতি-নাট্য রচনা করেছিলেন। রচনার কৌশলে সেগুলো খুবই উৎকর্ষ হয়েছিলো।

'রাখাল ছেলে' গীতি-নাট্য রচনার কিছুদিন পর সুকান্ত আর গোটা কয়েক গীতি নাট্য রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে 'সূর্য-প্রণাম' আর 'মধুমালতী' বিশেষ উল্লেখযোগ্যের দাবী রাখে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন সরলাদেবী তার ছেলে অরুণাচলকে দেশে রেখে এলেন, তখন তিনি স্কুলের সময়টুকু ছাড়া বাকী

সময়টুকু ছিলেন নিঃসঙ্গ। সে সময়ই তিনি সুকান্তকে খুব কাছে পেয়েছিলেন।

বাংলার পল্লীগ্রাম দেখার সৌভাগ্য হয়নি সুকান্তর। তাই সরলাদেবীর কাছে বসে শুনতেন যশোর, খুলনা, পাবনা প্রভৃতির কথা। আর পল্লী সৌন্দর্যের রস পান করতেন সে সব কাহিনী শুনে শুনেই।

যদিও সুকান্ত বাংলার পল্লীগ্রাম দেখেননি, তবু কিঞ্চিৎ জ্ঞান ছিলো পল্লী সম্বন্ধে। বিহারের পল্লীগ্রাম দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিলো তার একবার। তিনিও ফাঁকে ফাঁকে তার সেই অভিজ্ঞতার কাহিনী শোনাতেন। কখন বক্তা হন সুকান্ত, শ্রোতা সরলাদেবী আবার কখনও বা সরলাদেবী বক্তা, শ্রোতা হন সুকান্ত। আবার কোন কোন দিন বা স্বরচিত রচনা একে অপরকে পাঠ করে শোনাতেন।

একদিন সুকান্ত 'মধুমালতী' নামক একখানি গল্প পড়তে দিলেন সরলাদেবীকে। গল্পটি লেখা ছিলো একখানি বহু পুরাতন কাগজে। সরলাদেবীর বুঝতে অসুবিধা হলো না সুকান্তর কাগজেরও দারুণ অভাব।

সরলাদেবী 'মধুমালতী' সম্বন্ধে লিখেছেন—"মধুমালতীকে গল্প বলা চলে না। ছড়া কাব্য বলতে হয়। আশ্চর্য হয়ে গেলাম আমার ফাগুন সন্ধ্যার প্রতিরূপ দেখে। মধু যখন বানের জলে ভেসে যাচ্ছে, মালতী তখন ব্যাকুল হয়ে মধুকে ডাকছে; মধু স্রোতে ভেসে চলেছে। সেখানে গল্পটি নামের সার্থকতায় মধুময়। দেখলাম সুকান্তও মধুচক্র রচনা করতে জানে।"

সত্যি জানেন সুকান্ত।

ছোটবেলা থেকেই। মাত্র ন' কিংবা দশ বৎসর থেকেই বালক সুকান্ত ছোটদের জন্য মধুচক্র রচনা করেছিলেন।

সে তো আজকের শিশু মনে আধুনিক কবিরা সহস্র প্রশ্নের জবাব দিতে তৈরী।

স্বাভাবিক।

ঠিক স্বাভাবিক সুকান্তর বেলায় ও। কারণ, সুকান্তও ছিলেন যুগ বদলের কবি। কৃষাণ আর মজুরের জীবনের তিনি ছিলেন সত্যি-কারের অংশীদার। তার কথায় ও কাজে তাদের সাথেই ছিলো একান্ত ঘনিষ্ঠতা। আত্মীয়তা। সেই আত্মীয়তা অর্জন করে মাটির কাছাকাছি পেঁীছে তিনিই তো সাধারণ মানুষের কানে কানে শোনাতে পেরেছেন তাদের মর্মবেদনার ইতিহাস। নতুন দিনের সঙ্গীত।

সুকান্ত সেই কবি। দিন বদলের কবি।

একদিন কিশোর উপযোগী ছড়া আর কবিতা লিখে বাংলা সাহিত্যে সুকুমার রায়, সুনির্মল বসু প্রভৃতি কবিরা কিশোর মনে বিপুল সাড়া জাগিয়েছিলেন। ছোট ছোট কচি মনগুলোকে আনন্দে ভরিয়ে দিয়েছিলেন। জয় করেছিলেন তাদের মনকে।

আর রবীন্দ্রনাথ?

হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথও ছড়া নিয়ে প্রচুর গবেষণা করেছিলেন। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন শিশুদের কবিতা নিয়ে। প্রত্যেক মানুষের ভাবনা যেমন এক জায়গায় আটকে থাকে না, তেমনি কবির চিন্তাধারাও তার কাব্যের প্রকাশে নতুন নতুন পথের সন্ধান এনে দেন। তাই সেই প্রতিভা হয় নব দিকের দৃষ্টি। নতুন উৎস। আর কাব্যের সে সময়টা সেখানেই গিয়ে কেন্দ্রীভূত হয়। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সেই যুগের উৎস। আর ঐ উৎসের ধারাটাও বেশ কিছুদিন সমান-ভাবে থাকে।

তারপর সেই উৎসের ধারাটা এক সময় রূপ পেল অন্যরূপে। নতুন গতিতে ঘুরিয়ে দিলেন নজরুল।

তারপর?

তারপর অরেক নবদিকের দৃষ্টি খুলে দিলেন সুকান্ত।

যুগ যে এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে না। যুগ তো আর অনড় অটল, অক্ষয়, অব্যয় নয়।

মাত্র একুশ বছর বয়সে কৈশোরের সীমান্তে এসে সুকান্তর কবি প্রতিভার সমাপ্তি ঘোষণা করলো। অতএব তার লেখায় ছোটদের নিয়েই ঝোঁক বেশী থাকবে এতো স্বাভাবিক।

কিন্তু আশ্চর্য করেন সুকান্ত।

তার লেখা ছোটদের নিয়ে আরম্ভ করলেও সে রচনা গতানুগতিক ভাবধারার মধ্যে তলিয়ে যায়নি। হারিয়ে যায়নি।

'মিঠে-কড়া' নামে সঙ্কলিত হয়েছে সুকান্তর ছোটদের জন্য লেখা ছড়াগুলো। এক একটা ছড়া যেন শিশু মনের জীবন জিজ্ঞাসা! কারণ এতো আর আম্বিকালের বম্বি বুড়ির ছড়া নয়, একেবারে একালের টাট্‌কা হাতে গরম ছড়া।

ঘরে আমার চাল বাড়ন্ত
তোমার কাছে তাই,
এলাম ছুটে, আমায় কিছু
চাল ধার দাও ভাই!

সরল সুন্দর ছড়া। এ ছড়ার মধ্যে রূপকথার কোন স্পর্শ নেই। গন্ধও নেই। শুধু আছে বাস্তব কাঠিন্য। অপূর্ব প্রকাশ-ভঙ্গি।

বলতে পারো বড়ো মানুষ মোটর কেন চড়বে?
গরীব কেন সেই মোটরের তলায় চাপা পড়বে?

বড় শক্ত প্রশ্ন সুকান্তর। তার কিশোর মন হাহাকার করে উঠে এ প্রশ্নের সমাধান খুঁজতে।

আশ্চর্য!

এমন অদ্ভুত প্রশ্ন এত সুন্দর করে কিশোরদের মনের কাছে আর কখনও কেউ করেননি। এ তো চিরন্তন সত্য রূপ।

কিশোর মনে এ বুঝি এক বাস্তব ধাঁ-ধাঁ!

বলতে পারো ধনীর বাড়ী তৈরী যারা করছে,
কুঁড়ে ঘরে তারা কেন মাছির মতো মরছে?

কিংবা,

বলতে পারো ধনীর মুখে যারা যোগায় খাদ্য,
ধনীর পায়ের তলায় তারা থাকতে কেন বাধ্য?

না, এমন ধাঁ-ধাঁ সুকান্তর আগে কেউ কখনও ছোটদের দরবারে উপস্থিত করেননি। একমাত্র সুকান্তই বলেছেন—'বড় লোকের ঢাক তৈরী গরীব লোকের চামড়ায়।'

'পুরাতন ভৃত্য'তে রবীন্দ্রনাথ কেষ্টাকে দেখেছিলেন যে ভাবে সুকান্ত কিন্তু সে ভৃত্যকে দেখেন নি। সুকান্তর দেখা চাকর হরি বলে—

আপনারই দেখাদেখি ব্ল্যাক্-মার্কেট করি।

অসামাজিক চিত্র এঁকেছেন সুকান্ত জমিদারদের নিয়ে। এমনি এক জমিদার ধনপতি পাল। তিনি ফিক্-ফিক্ করে হাসতে হাসতে বলেন—

বলা ভারি শক্ত,
সবচেয়ে ভাল খেতে গরীবের রক্ত।

আবার সুকান্ত কিশোর মনকে নিয়ে গেলেন অন্য এক সমস্যার ভেতর। তিনি যে মনে মনে বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন সেগুলো। তাই চিরন্তন সত্যের দিকে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে এলেন।

কি অদ্ভূত আমাদের সমাজ-ব্যবস্থা! সত্যি আশ্চর্য হতে হয়। তাই তিনি লিখলেন 'ভেজাল' কবিতা।

ভেজাল, ভেজাল, ভেজালরে ভাই, ভেজাল সারা দেশটায়,
ভেজাল ছাড়া খাঁটি জিনিষ মিলবে নাকো চেষ্টায়।

এ রূপ তো আজও সমান ভাবে চলেছে। খাদ্যে, শিশুর খাদ্যে, এমন কি ঔষধে পর্যন্ত সমান ভাবে ভেজাল চলেছে।

খাদ্যাভাবের দিনেও সুকান্তর মন ব্যথায় টন্‌টন্‌ করে উঠেছিলো। একদিকে চরম দারিদ্রতা, অন্যদিকে বিলাস আর অপচয় চলছে তখন ধনীর বাড়িতে। 'বিয়ে বাড়ির মজা' কবিতায় সুকান্ত সমাজের সেই মোখস খুলে দিলেন—

আসুন, আসুন—বসুন সবাই, আজকে হলাম ধন্য,
যৎসামান্য এই আয়োজন আপনাদেরই জন্য ;
মাংস, পোলাও, চপ-কাটলেট, লুচি আর মিষ্টি
খাবার সময় এদের প্রতি দেবেন একটু দৃষ্টি।

কিন্তু দেশে তখন দুর্ভিক্ষ। অথচ ধনীর গৃহে তখনও চলছে অপচয়। তাই তার কবিতার শেষের দিকে অসামাজিক চিত্র আঁকলেন—

বললে পুলিশ ঃ এই কি কর্তা, ক্ষুদ্র আয়োজন ?
পঞ্চাশ জন কোথায় ? এ যে দেখছি হাজার জন !
এমনি করে চাল নষ্ট দুর্ভিক্ষের কালে ?
থানায় চল, কাজ কি এখন এইখানে গোলমালে !

বিয়ে বাড়ির দুয়ারের কাছে অনাহারে শীর্ণকায় ভিখারীরা এসে জড়ো হয়েছিলো কিছু খাদ্যের আশায়। যদি দয়া করে কিছু দেয়। হঠাৎ তারা এই করুণ দৃশ্য দেখে পুলকিত হয়ে উঠে। তাই সুকান্ত এই কবিতার পেষ পক্তিতে লিখলেন—

কর্তা হলেন কাঁদো-কাঁদো, চোখেতে জল আসে,
গেটের পাশে জড়ো-হওয়া কাঙালীরা হাসে।

সুকান্ত তার চার পাশে যা দেখেছেন সেগুলো ভাবের চশমা চোখে দিয়ে দেখেন নি। তিনি দেখেছেন যা বাস্তব তাই।

কুঁড়ে ঘরের মা সারা দিন খাটে
কাজ করে সারা বেলা এ,
পরের বাড়িতে ধোয়া-মোছা কাজ
বাকীটা পোষায় সেলায়ে।
তবুও ভাঁড়ার শূন্যই থাকে,
থাকে বাড়ন্ত ঘরে চাল,
বাচ্চা ছেলেরা উপবাস করে
এমনি করেই কাটে কাল।

কিশোরদের নতুন দৃষ্টিতে দেখতে শেখান সুকান্ত। তাই পরাধীনতার দিনে সুকান্ত লিখেছেন—

নানা সাহেব, তাঁতিয়া টোপি, ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মী,
এদের নামে দৃপ্ত কিশোর খুলবে তোমার চোখ কি ?

পরাধীনতা ভীষণ ভাবে সুকান্তকে আঘাত করেছিলো। তাই যখন ইংরেজ বিরোধী বিপ্লব শুরু হলো তিনি সবাইকে অগ্রনী হতে আহ্বান জানিয়ে লিখলেন—

ডাংগুলি খেলা নয়, গুলির সঙ্গে খেলা,
রক্ত রাঙানো পথে দু'পাশে ছেলের মেলা;
দুর্দম খেলা চলে, নিষেধে কে কান দেয় ?
ও-বাড়ি ও ও-পাড়ার কালো, ছোটু প্রাণ দেয়।
স্বচক্ষে দেখলাম বস্তির আলীজান,
'আংরেজ চলা যাও' বলে ভাই দিল প্রাণ।

সুকান্তর এ ছড়া যথার্থই আমাদের জীবন জিজ্ঞাসার ছড়া।

নির্যাতিত মানুষের অন্তরের কথা। বাংলা সাহিত্যে এর মূল্য অতুলনীয়। কারণ এ যে এক চিরন্তন রূপ। এমন ছড়া বাংলাদেশে আর কোন কবি লিখেছেন বলে জানা নেই।

১৩৪৭ সালের পৌষমাস।

সুকান্তর প্রথম কবিতা ছাপা হলো 'শিখা' পত্রিকায়। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন বিজনকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

হ্যারিসন রোড আর কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে সে সময় সুকান্তর বড় দাদা মনোমোহন ভট্টাচার্যের একটি বইয়ের দোকান ছিলো। এই প্রতিষ্ঠানটির নাম ছিলো 'সাহিত্য মন্দির'।

মনোমোহন নিজেও একজন শিল্পী। আর ঠিক রাস্তার মোড়ে দোকান থাকায় তখনকার শিশু সাহিত্যিকরা তাদের আসা যাওয়ার মাঝে এখানে বসে খানিক গল্প-গুজব করে যেতেন। বিশেষ করে আসতেন হেমেন্দ্রকুমার রায়, সুনির্মল বসু, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, আর 'শিখা' পত্রিকার সম্পাদক বিজনকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

সুকান্ত মাঝে মাঝে যেতেন দোকানে। নানারকম বইপত্র নাড়াচাড়া করতেন নিজের খেয়াল খুশি মতো। কখনও বা বইয়ের রাজ্যে নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলতেন। সে সময়ই সুকান্ত পরিচয় পেয়েছিলেন যারা আসতেন তাদের সকলের।

সুতরাং বড় দাদার শরণাপন্ন হলেন সুকান্ত। বাড়ীতে একদিন তার দাদাকে বললেন বিজনবাবুর 'শিখা' পত্রিকায় তার লেখা ছাপিয়ে দেবার জন্য।

মাতৃহারা ছোট ভাইকে কিন্তু সেদিন মনোমোহন বাবু হতাশ করতে পারেন নি। তাই তার বন্ধু বিজনবাবুকে দিয়ে সুকান্তর লেখা ছাপিয়ে দিয়েছিলেন। এর পর তার লেখা কবিতা এবং জীবনী-কাহিনী আরও অনেকবার ঐ 'শিখা' পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। আরও

পরে সুকান্তর কবিতা তৎকালীন বিভিন্ন কাগজে খুব নিষ্ঠার সঙ্গে ছাপা হয়েছিলো।

১৯৪১ সালের প্রায় শেষ দিকের কথা।

তখনই কিশোর সুকান্ত প্রথম সুযোগ পেলেন রেডিওতে।

সুকান্ত ছোটবেলা থেকেই গল্প দাদুর আসরের সভ্য ছিলেন।

সুতরাং ঐ বিভাগেই তিনি রবীন্দ্রনাথের 'শীতের আহ্বান' কবিতাটি আবৃত্তি করলেন।

বরাবরই সুকান্ত ছিলো রেডিও সম্পর্কে গভীর আগ্রহ। অথচ তার বাবা কিংবা জ্যাঠামশায় ছিলেন গোড়ো ব্রাহ্মণ। সে জন্যই তাদের সংসারে রেডিও স্থান পায়নি। তাদের চিন্তা ধারায় ছিলো ওটা সম্পূর্ণ শৌখিনতা। বিলাসিতা।

সে তো খুবই স্বাভাবিক।

কিন্তু সুকান্ত?

তার তো কবি মন। শিল্পী মন।

না, ভাল লাগতো না সুকান্তর। তার কবি মনকে অতিষ্ঠ করে তুলতো বাড়ীর স্নেহ-মায়া বর্জিত পরিবেশ।

সুতরাং তার শিল্পী মনের চাহিদা পূরণ করতে দরকার উপকরণের। এই উপকরণ কোথায় পাবেন সুকান্ত!

না, নিজের বাড়ীতে রেডিও ছিলো না। তাই তার নিজের বাড়ীকে সব সময়ই মনে হতো নীরস।

অনাস্বাদিত কৌতূহল পূরণের একটিই মাত্র পথ ছিলো। সে তার দাদার বাড়ী।

সুকান্তর দাদা মনোমোহন ভট্টাচার্য তখন তাদের পাশেরই একটি বাড়ীতে থাকতেন। সেখানেই তিনি পৃথক সংসার গড়ে তুলেছিলেন। তিনি একজন প্রতিষ্ঠাবান শিল্পী ছিলেন নিজে। কাজেই তার বাড়ীতে কবি মনকে আকর্ষণ করার মতো অনেক উপকরণ থাকতো

সর্বসময়। ঘরের দেয়ালে দেয়ালে ঝুলানো থাকতো দামী সুন্দর সুন্দর ছবি। যা কবি মনকে খুব সহজেই আকৃষ্ট করে। আর নানা রকম গান শোনার জন্য ছিলো রেডিও, গ্রামোফান। যা কবি মনকে খুব সহজেই আকৃষ্ট করে।

সুতরাং সুকান্ত নিজের মতো করে স্থান করে নিলেন দাদার বাড়ীতে। প্রায় সময়ই তিনি ছুটে আসতেন। আর রেডিওর খুব কাছে বসে প্রায় একরকম কান ঠেকিয়ে গান শুনতেন।

কেনই বা আসবেন না সুকান্ত! যদিও দাদা বৌদির পৃথক সংসার, তবু এই দাদা বৌদি সুকান্তকে ভীষণ স্নেহ করেন। আর এই স্নেহের দাবী সুকান্তর কাছে ও বিরাট।

সুকান্তর জীবনে অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন কয়েকজন। সে সব বন্ধুদের মধ্যে রেডিওর স্থান খুব নগন্য নয়। বরং বেশী। তাই বুঝি বন্ধুত্বের এই বন্ধনকে চিরস্থায়ী করতে সুকান্ত লিখেছিলেন—

বেজে চলে রেডিও
সর্বদা গোলমাল করতেই
রেডিও।

ছোটবেলা থেকেই সুকান্ত ছিলেন রবীন্দ্র ভক্ত-প্রাণ। সর্বসময় রেডিওর কাছে বসে তিনি শুনতেন রবীন্দ্র-সঙ্গীত। বিশেষ করে যদি সেই রবীন্দ্র-সঙ্গীত তার প্রিয় শিল্পী পঙ্কজ কুমার মল্লিকের কণ্ঠে হয় তবে কি আনন্দ তখন তার।

স্কুলের পড়াশুনোয় সুকান্ত কোনদিনই বড় একটা আগ্রহান্বিত ছিলেন না। নেহাৎ বাড়ী থেকে পাঠায় তাই যাওয়া। আসলে গৃহ অশান্তিকে বড় ভয় করতেন তিনি। তবু তার কবি মন অবরুদ্ধ থাকতে চাইতো না ঐ স্কুল বাড়ীর চার দেয়ালে ঘেরা সংকীর্ণ পরিবেশে। তার কবিমন ঘুরে ঘুরে বেড়াতো অবহেলিত নির্যাতিতদের ঘরের আনাচে কানাচে। সুতরাং তার বিক্ষুব্ধ মনকে তিনি আবদ্ধ

করে রাখবেন কি করে! তাই তিনি নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে স্কুলে বসে শিক্ষকদের দৃষ্টির আড়ালে পড়তেন নানা রকম কবিতা আর উপন্যাসের বই। অনেকবার ধরাও পড়েছেন শিক্ষকদের হাতে।

তার উপর আবার রেডিও।

এই রেডিওর কাছে বসে সুকান্ত ভুলে যেতেন সব। ভুলে যেতেন যেন স্কুলে যাওয়ার কথা, পরীক্ষার কথা, তার পড়াশুনোর কথা।

সুকান্তর অন্তরঙ্গ বন্ধু ও কবি অরুণাচল বসু সুকান্তর স্কুল জীবনের একটি সুন্দর চিত্র তুলে ধরেছেন—

'টিনের বাড়ির সামনের রাস্তার বিপরীত দিকে দাদার দোতালায় বসে গান্ধীজীর মতো সুকান্তর 'মৌনদিবস'। অবশ্য সপ্তাহে একদিন নয়, পুরো সাতটা দিন।

পরীক্ষা এসেছে।

—পড়াশুনা করবি, না?

কাকস্য পরিবেদনা।

—বাংলা পরীক্ষা তো, ফুঃ!

টেকস্ট বুকের ধার কে ঘেসে? ঠিক হলো—যাই প্রশ্ন আসুক সুধীন দণ্ডীয় ভাষায় জবাব দিতে হবে। মাঝে মাঝে দু'একটা শব্দ অবশ্য বানিয়ে ও দিতে হবে। যার আসল অর্থ কিন্তু হিং-টিং-ছট্। বাংলার মাষ্টারমশাই খাতা দেখবেন। তিনি ওকে আমাকে স্নেহ আর সমীহার চক্ষে দেখতেন বেশ খানিকটা।

দেওয়া হলো পরীক্ষা।

তারপর হাসাহাসি—কে কটা নতুন শব্দ বাংলা ভাষায় ঢুকিয়ে দিলাম।'

কিন্তু এবার?

এবার তো আর বাংলা নয়, ঐ নীরস বিষয়—অঙ্ক।

কি করা যায়?

অঙ্কের সঙ্গে আবার তু'জনেরই ভীষণ বিবাদ।

সুকান্ত বরাবরই অঙ্কে কাঁচা ছিলেন। এই প্রসঙ্গে সরলা দেবী একস্থানে বলেছেন—'ও তখন বেলেঘাটা দেশবন্ধু স্কুলে পড়ে। কি ক্লাস ঠিক মনে নেই, আমি ওর পরীক্ষার খবর জানতে চাইলাম। সব নম্বর বলল, অঙ্কর নম্বর বাদে। আমি নাছোড়বান্দা। অঙ্কের নম্বর জানতে চাইলাম। ও মুখ নীচু করে বড় বিনয়ের সঙ্গে ছোট্ট গলায় বলল, ফাইভ।'

বাংলার পরের দিনই অঙ্ক পরীক্ষা। অরুণাচলের জিভ যেন চিন্তায় শুকিয়ে যাচ্ছিলো। ভয়ে হাত পা কাঁপছিলো।

ঈশ্বর বুঝি সদয়।

অরুণাচল যখন ভাগ্যের উপর নির্ভর করে তুশ্চিন্তার জাল বুনছিলেন, ঠিক সে সময় তার এক সহপাঠী বন্ধু এসে হাজির হলেন তার কাছে।

বন্ধুটি তখনও হাঁপাচ্ছিলো।

কপালে বিন্দু বিন্দু চন্দন টিপের মতো ঘামের ফোঁটা।

অরুণাচল বুঝলেন কিছু একটা ব্যাপার ঘটেছে। তাই তাদের এই বন্ধুটি দৌড়াতে দৌড়াতে এসেছে খবরটা দিতে। কিংবা সমাধানের পথ খুঁজে নিতে।

ব্যাপারটা কি ?

সহপাঠী বন্ধুট তখনও হাঁপাচ্ছিলো। তাকে জিজ্ঞেস করা হলেও সে কোন উত্তর দিতে পারছিলো না।

অরুণাচল হতভম্ব।

কিছুটা সময় গেল ধাতস্থ হতে।

এই নে অঙ্কের কোশ্চেন।

তার মানে ?

অরুণাচলের গলায় বিস্ময়।

সহপাঠী বন্ধুটি সহজ সরল ভাবেই বলল, এই প্রশ্নগুলো পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে আছে। কথা আছে, শিগ্গীর মুখস্থ করে নে।

কি করে জানলি, এগুলো যে আসবেই ?

বহু কষ্ট করে। তবে নিশ্চিন্ত থাক এগুলো আসবেই।

অরুণাচল পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারলেন না। আবার যেন ঠিক অবিশ্বাসও করতে পারছিলেন না। স্কুলে সুকান্ত আর অরুণাচলকে ভালবাসে না এমন ছেলে প্রায় ছিলোই না। তার উপর অঙ্কের সঙ্গে যে তাদের দু'বন্ধুর খুব একটা সৎভাব নেই একথাও জানে সকলে। তাই তো আগ্রহান্বিত হয়ে ছুটে এসেছে জানাতে।

কয়েকবার অঙ্কগুলো ভাল করে দেখলেন অরুণাচল।

এবার বুঝি ফেলের দুর্নামটা ঘুচবে।

সুকান্তকে এক্ষুনি জানানো প্রয়োজন। তাই প্রশ্নগুলো হাতে নিয়ে ছুটলেন তার বাড়ীর দিকে।

না, সুকান্ত বাড়ীতে নেই।

কোথায় সুকান্ত ?

অরুণাচল আবার ছুটলেন পাশেই তার দাদা মনোমোহন ভট্টাচার্যের বাড়ীর দিকে।

সেখানেই দর্শন পাওয়া গেল সুকান্তর।

দাদার বাড়ীতে রেডিওর খুব কাছাকাছি বসে মনযোগ দিয়ে গান শুনছিলেন তিনি। কোন দিকে কোন খেয়াল ছিলো না তার।

অরুণাচল ডাকলেন সুকান্তকে।

তিনি কিন্তু শুনতে পেলেন না সে ডাক। রেডিওর দিকে তাকিয়ে তন্ময় হয়ে বসে আছেন যেন।

হাতের কাগজ দেখিয়ে অরুণাচল এবার তার হাত ধরে টেনে নিয়ে এলেন বাইরে। এক রকম জোর করেই।

বাইরে এনে বললেন, এই নে সুকান্ত, এই অঙ্কগুলো খুব তাড়াতাড়ি ভাল করে দেখে নে। অঙ্কে পাশ করার স্বর্ণ সুযোগ

এবার। একটু তৈরী করে নিলেই এত দিনের স্কুলের দুর্ণামটা ঘুচবে।

কে কার কথা শোনে!

সুকান্তর কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র নেই।

নীরব চোখে খানিকটা সময় তাকিয়ে রইলেন তিনি। আসলে তার মন পড়ে রয়েছে রেডিওর কাছে। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সুমধুর সুর কাটিয়ে হয়তো অরুণাচলের কথাগুলো তার কানে যথার্থভাবে পেঁ ছায়নি।

তাই সুকান্ত চলে এলেন অরুণাচলকে ফাঁকি দিয়ে। আবার এসে বসলেন রেডিওর গা ঘেসে। মুহূর্তের মধ্যেই তিনি আবার রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সুরের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন।

আসলে রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতা যেন তাকে উন্মাদ করে দিতো! তার দেহ মনে ছড়িয়ে দিতো একটা প্রচ্ছন্ন মাদকতা।

না হোক তার অঙ্কে পাশ করা। নাইবা পেল নম্বর। কিন্তু এমন উদাত্ত কণ্ঠের রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সুরের ঝংকার শোনার সুযোগ ক'বার আসে জীবনে! যদি না আসে আর?

রবীন্দ্র কবিতা বা সঙ্গীতে সত্যি পাগল করে তুলতো সুকান্তকে।

সুকান্তর রবীন্দ্র-অনুরাগ ছোটবেলা থেকেই।

শিশুকাল থেকেই রাণীদির কণ্ঠে শুনেছেন রবীন্দ্রনাথের কবিত আবৃত্তি। কত সময় রাণীদির সাথে সুর মিলিয়ে শিশু সুকান্তও আধো আধো স্বরে কবিতা আওড়ে যেতেন।

এ ভাবেই শিশু সুকান্তর বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবির কবিতার সঙ্গে পরিচয় ঘটে। ক্রমে তার অন্তরের অন্তস্থলে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও রবীন্দ্রনাথ এক বিশেষ শ্রদ্ধার আসন লাভ করেন।

আরও কিছুদিন পরের কথা।

ধ্যানের রবীন্দ্রনাথকে স্বচক্ষে দেখার সুযোগ পেলেন সুকান্ত। সে দিনটা ছিলো মহাজাতি সদনের ভিত্তি প্রস্তর প্রতিষ্ঠার দিন।

রবীন্দ্রনাথ মিনন্ত্রিত হয়েছিলেন মহাজাতি সদনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের জন্য।

কবিকে দেখার জন্য কবির শিশুমন অস্থির হয়ে উঠে।

নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই সুকান্ত তার পিতার সঙ্গে মহাজাতি সদনে এসে হাজির হলেন। অনেক লোকের মাঝে অধীর আগ্রহে নীরবে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

সুকান্তর ধ্যান আর স্বপ্নের রবীন্দ্রনাথ।

সময় এগিয়ে চললো। অপেক্ষা আর অপেক্ষা।

দীর্ঘ প্রতীক্ষা।

এক সময় এলেন রবীন্দ্রনাথ।

মহাজাতি সদনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হলো যথাসময়ে। ভাষণ দিলেন রবীন্দ্রনাথ!

সুকান্তর পিতা তাকে কাঁধে তুলে দেখালেন কবিকে। তিনি দেখলেন পরম বিস্ময়ে।

বালক কবি মন আর এক চিরকিশোর কবিকে দেখে যেন মুগ্ধ হয়ে গেলেন। সার্থক করলেন নিজের জীবনকে।

দেখলেন বার বার।

না, তবু যেন তার দু'চোখের তৃপ্তি হয় না।

আশ্চর্য! এত দূর থেকে দেখলে কি নয়নের তৃপ্তি হয় নাকি?

সুতরাং দূর থেকে দেখে দেখে পিপাসার নিবৃত্ত হলো না সুকান্তর। এগিয়ে গেলেন তাই কাছে। রবীন্দ্রনাথের একেবারে কাছে গিয়ে পরম বিস্ময়ে একান্ত উৎসুক ভাবে বড় বড় চোখ করে কবির দিকে অপলক নয়নে তাকিয়ে রইলেন।

সুকান্ত যেন পেলেন নতুন প্রেরণা।

অনুষ্ঠান শেষ হলো।

বাড়ী ফিরে এলেন সুকান্ত তার পিতার সঙ্গে। মন তার খুবই প্রফুল্ল। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর যেন দেব দর্শন করে এলেন তিনি। যেন তীর্থস্থান ঘুরে ফিরে এলেন নিজের বাড়ীতে।

নয় দশ বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথের কবিতা অনর্গল ভাবে আবৃত্তি করে যেতেন সুকান্ত। আড়াল থেকে যারাই শুনেছেন তার সেই আবৃত্তি, তারাই প্রথমটায় চমকে উঠতেন। স্বয়ং যেন রবীন্দ্রনাথই আবৃত্তি করছেন ঠিক এমন।

আর হাতের লেখা ?

বাংলার অনেক সাহিত্যিকই সুকান্তর হাতের লেখা দেখে রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখা মনে করে ভুল করেছিলেন। তিনি ঠিক যেন অনুসরণ করেই তৈরি করেছিলেন হাতের লেখা।

তাই তাকে দেখতে পাই রবীন্দ্র অন্তঃ প্রাণ হিসাবে। বিশ্বকবির প্রতি তার এই অনুরাগের ফল হিসাবেই সুকান্ত লিখলেন ছড়ার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের জীবনকাহিনী। এই রচনা বাংলা সাহিত্যে এক দুর্লভ বস্তু।

এক যে ছিলো আপন ভোলা কিশোর,
ইস্কুল তার ভাল লাগত না,
সহ্য হত না পড়াশুনার ঝামেলা।
আমাদের চলতি লেখাপড়া সে শিখল না কোন কালেই
অথচ সে ছাড়িয়ে গেল সারা দেশের সবটুকু পাণ্ডিত্যকে।
কেমন করে ? সে প্রশ্ন আমাকে করো না ॥

রেডিও! সুকান্তর প্রিয় বন্ধু রেডিও।

এই রেডিও পেলে সুকান্ত ভুলে যেতেন সব। ভুলে যেতেন পৃথিবীর যাবতীয় পার্থিব অপার্থিব বস্তুর কথা।

কবি-মন চাইতো, তিনিও রেডিওতে কবিতা আবৃত্তি করেন।

কিন্তু কি করে সম্ভব ?

অবশেষে সম্ভব হলো একদিন। কি ভাবে সম্ভব হলো এই প্রসঙ্গে

তার বড় দাদা মনোমোহন ভট্টাচার্য তার ছোট ভাইয়ের স্মৃতি চারণ করতে গিয়ে বলেছেন—

"…রেডিওর 'গল্প দাদুর আসরে' ওর রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠ করার প্রোগ্রামের ব্যবস্থাও আমার দোকানে বসে বসেই আমি করে দিই। নৃপেনদা—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় তখন রেডিওর প্রোগ্রাম-ডাইরেক্টর, 'গল্পদাদুর আসর' তিনিই পরিচালনা করতেন তখন।

একদিন বললাম, নৃপেনদা, আমার ছোট ভাই আপনার আসরের একটা প্রোগ্রাম পাবে না ?

নৃপেনদা তো উদার দাক্ষিণ্যের দু'হাত সব সময় বাড়িয়েই আছেন। বললেন, পাঠিয়ে দিস রেডিও অফিসে আমার কাছে।

পাঠিয়েছিলাম সুকান্তকে।

দু' একবার যাওয়ার পরেই রবীন্দ্রনাথের 'শীতের আহ্বান' কবিতাটি পড়েছিলো সুকান্ত রেডিওর 'গল্পদাদুর আসরে।'

রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের প্রথম বার্ষিকীতে সুকান্ত 'প্রথম বার্ষিকী' কবিতাটি রচনা করেন। আর তিনি রেডিওতে কবিতাটি আবৃত্তিও করেছিলেন।

আবার ফিরে এল বাইশে শ্রাবণ
আজ বর্ষা শেষে হে অতীত,
কোন সম্ভাষণ
জানাব অলক্ষ্য পানে ?
আজিও মৃতের গন্ধে ব্যথিত জনতা।
কহিছে নিঃশব্দ স্বরে একমাত্র কথা
"তুমি হেথা নাই"
বিস্ময়ের অন্ধকারে মুহ্যমান জল স্থল তাই
আধো তন্দ্রা, আধো জাগরণে
দক্ষিণ হাওয়ায় ক্ষণে ক্ষণে
ফেলিছে নিঃশ্বাস।

১৯৪১ সালের ৭ই আগষ্ট।

গত হলেন বিশ্ববরেণ্য কবি। কবির মৃত্যুতে শোকাচ্ছন্ন হলো গোটা ভারতবর্ষ। শোকের ঢেউ প্লাবিত হলো প্রতি ঘরে ঘরে। স্পর্শ গিয়ে লাগলো প্রতিটি মানুষের মনের মণিকোঠায়।

কবিগুরুর জোড়াসাঁকোর বাড়ী। তাঁর বিচ্ছেদ-বেদনায় কাতারে কাতারে লোক গিয়ে হাজির হতে লাগলো সেখানে। প্রিয় কবির বিয়োগ ব্যথায় সুকান্তর কবি-চিত্ত অনেকখানি কাতর হয়ে পড়ে। অনেকের মতো সুকান্তও গিয়ে দাঁড়ালেন কবির বাড়ীতে।

শোক যাত্রায় এগিয়ে গিয়েছিলেন সুকান্ত। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হয়ে যাওয়ার পর একান্ত প্রিয়জনকে হারিয়ে শূন্য মনে ফিরে এসেছিলেন তিনি। সেই বিচ্ছেদ বেদনার করুণ ছাপ যেন খুঁজে পাওয়া যায় সুকান্তর লেখা 'সূর্য-প্রণামে'।

সুকান্ত 'যাত্রা' কবিতায় লিখেছেন—

অমৃত লোকের যাত্রী হে অমর কবি, কোন প্রস্থানের
পথে তোমার একাকী অভিযান। প্রতিদিন তাই
নিজেরে করেছ মুক্ত, বিদায়ের নিত্য আশঙ্কায়
পৃথিবীর বন্ধ ভিত্তি নিশ্চিহ্ন করতে বিপুল প্রয়াস
তব দিনে দিনে হয়েছে বর্ধিত।...

রবীন্দ্রনাথের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় কবি সুকান্তকে খুব বেদনাহত করেছিলো। তাই পরবর্তী অংশে লিখেছেন—

...চেয়ে দেখি চিতা তব জ্বলে যায় অসহ্য
দাহনে জ্বলে যায় ধীরে ধীরে প্রত্যেক অন্তর॥
তুমি কবি, তুমি শিল্পী, তুমি যে বিরাট, অভিনব
সবারে কাঁদায়ে যাও চুপি চুপি একি লীলা তব॥

সুকান্ত বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথকে অস্বাভাবিক রকম ভাল বাসতেন। তাঁকে দেবতার মতো স্থাপন করেছেন নিজের অন্তরে। তিনি যে তার ধ্যান ও স্বপ্নের ধন। সুতরাং রবীন্দ্রনাথকে ফিরে পাবার জন্য তাঁর মন যেন বার বার চঞ্চল হয়ে উঠতো।

সুকান্তর কাতর মনের হাহাকার রূপ পেলো 'পঁচিশে বৈশাখের উদ্দেশ্যে' নামক কবিতায়। তাঁর জন্ম তিথি পঁচিশে বৈশাখ লিখেছিলেন কবিতাটি—

আমার প্রার্থনা শোন পঁচিশে বৈশাখ,
আর একবার জন্ম দাও রবীন্দ্রনাথেরে,
হতাশায় স্তব্ধ বাক্য, ভাষা চাই আমরা নির্বাক
পাঠাব মৈত্রীর বাণী সারা পৃথিবীকে জানি ফের····
··এবার নতুন রূপে দেখা দিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বিপ্লবের স্বপ্ন চোখে, কণ্ঠে গণ-সঙ্গীতের সুর
জনতার পাশে পাশে উজ্জ্বল পতাকা নিয়ে হাতে
চলুক নিন্দাকে ঠেলে, গ্লানি মুছে আঘাতে আঘাতে।
যদিও সে অনাগত, তবু যেন শুনি তার ডাক
আমাদেরই মাঝে তাকে জন্ম দাও পঁচিশে বৈশাখ!

রবীন্দ্র-প্রশস্তি। তাঁর জন্মদিন পঁচিশে-বৈশাখে অনেকেই তো কত ভাবে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এ প্রকাশ-ভঙ্গী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের। এর সুর, স্বাদ একেবারেই আলাদা।

সত্যি আশ্চর্য হতে হয়।

বলিষ্ঠ কণ্ঠে ক'জন কবি ঘোষণা করতে পেরেছেন,—চোখে বিপ্লবের স্বপ্ন নিয়ে কণ্ঠে জনতার সঙ্গীতের সুরে, পতাকা বাহুতে নিয়ে সমস্ত নিন্দাকে ঠেলে, আঘাতে গ্লানি মুছে ফেলে রবীন্দ্রনাথের নতুন ভাবে জন্মের প্রয়োজনীয়তাকে?

না, কেউ করেন নি।

তাই সুকান্তর রবীন্দ্র-প্রশস্তির সুর সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের। ভিন্ন স্বাদের।

রবীন্দ্র প্রতিভা সুকান্তর মনে গভীর ভাবে দাগ কেটেছিলো।

একেবারে শিশুকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথের কবিতা রাণীদি'র কণ্ঠে আবৃত্তি শুনে শুনে বিশ্ব-বরেণ্য কবির প্রতি তার শ্রদ্ধা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে যখন তিনি বড় হতে থাকেন অর্থাৎ শিশু থেকে ছাড়পত্র পেয়ে বালকে পদার্পন করলেন, তখন রবীন্দ্রনাথ তার চোখে ধরা পড়লেন নতুন রূপে। তাই তো তিনি রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করে লিখেছেন —

এখনো আমার মনে তোমার উজ্জল উপস্থিতি,
প্রত্যেক নিভৃত-ক্ষণে মত্ততা ছড়ায় যথারীতি,
এখনো তোমার গানে সহসা উদ্বেল হয়ে উঠি
নির্ভয়ে উপেক্ষা করি জঠরের নিঃশব্দ ভ্রূকুটি।

সুকান্তর মনে সত্যি বিশ্বকবি ছিলেন উজ্জ্বল। তার উপস্থিতি বালক সুকান্তকে উন্মত্ত করে তুলতেন। জঠরের নিঃশব্দ ভ্রূকুটিকে পর্যন্ত তিনি নির্ভয়ে উপেক্ষা করেছেন, যখন তার উদ্বেল করা সঙ্গীত শুনেছেন।

তাই বালক সুকান্তকে দেখা গেছে পাড়ার সমবয়সীদের জুটিয়ে একটি সংস্থা তৈরী করতে। সম্ভবত তার বালক মনের এক বিরাট ক্ষুধাকে নিবৃত্তি করার জন্যই এই সংস্থা। এই প্রচেষ্টা।

সিদ্ধান্ত নিলেন সুকান্ত।

এই সংস্থার কাজ হবে নাটক করা। রবীন্দ্রনাথের লেখা নাটক।

সে জন্যই তিনি স্থির করলেন পাড়ায় সমবয়স্ক ছেলেদের সঙ্গে জোট বাধার। বাধলেন ও তাই।

প্রথম নাটক করলেন রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর'।

না, এ নাটক কোন মঞ্চে অভিনীত হয়নি! এ নাটক করেছেন নিজেদের পাড়ায়। সুকান্তদের রান্নাঘরের বারান্দায়। সেখানেই মঞ্চ তৈরী করেছেন। বাড়ীর মেয়েদের পড়ার কাপড় দিয়ে সে মঞ্চ তৈরী হয়েছিলো।

অমলের ভূমিকা নিলেন সুকান্ত নিজে।

সুন্দর ভাবে অভিনীত হয়েছে। দর্শক হিসাবে লোকজনও জড়ো হয়েছিলেন প্রচুর। বয়ঃজ্যোষ্ঠ লোকেরও অভাব হয়নি।

অভিনয়ের সে কি কুশলতা! যারা দেখেছেন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছেন। সবারই এক প্রশ্ন, এমন প্রাণবন্ত অভিনয় বালক সুকান্ত করলেন কেমন করে?

তারপর 'মুক্ত ধারা' নাটক।

এর পর একে একে আরও এ জাতীয় নাটক অভিনীত হলো।

সুকান্তর কবি প্রতিভা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে গুরুর আসনে আরোহণ করালেন।

রবীন্দ্রনাথের গীতি-নাট্য সুকান্তকে আকর্ষণ করলো। সুকান্ত বিশ্ব কবির গীতি-নাট্য গুলোর ধরণ অনুসরণ করে লিখলেন 'অভিযান'।

'অভিযান' গীতি-নাট্য!

যদিও নাটকটি রূপকথা, তবু কবির চিন্তা ও প্রকাশ ধারা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে রূপকথার গল্পের মতো প্রকাশ পায়নি। বরঞ্চ বলা চলে, রূপকথার ছকে লেখা হলেও আসলে কিন্তু এর অন্তরালে দেখিয়েছেন পঞ্চাশের মন্বন্তরের কিছু ঘটনা।

বিস্ময় কর সে ঘটনাপঞ্জি।

তেরশ' পঞ্চাশ সালে বাংলা জুড়ে যে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিলো, তার ফলে বাংলা মায়ের সর্বঅবয়বে প্রতিফলিত হলো

শোকের ছায়া। অভাবের হাহাকার উঠলো প্রতি ঘরে ঘরে। একদিকে অনাহারের দুঃসহ যাতনা অপরদিকে মৃত্যুও ব্যাধির প্রচণ্ড রূপ। কঙ্কালসার নরনারীর মধ্যে কবি যা দেখেছেন, সেই বাস্তব রূপেরই প্রতিফলন 'অভিযান' গীতি-নাট্য।

ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের কবলে সংকলিতার দেশ। সেখানে নরনারী শিশু নিপীড়িত প্রচণ্ড ক্ষুধার তাড়নায়। বিভীষিকার দুর্দান্ত দাপট চলছে। দুর্বিসহ প্রতিটি মানুষের মন। অনাহারে, দুঃসহ যন্ত্রণায় সেখানে ব্যাধি আর মৃত্যু যেন পাঞ্জা লড়ে চলেছে।

নিঃস্ব সংকলিতা। তবু সে অন্তরে দুর্বল নয়। বরং স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বলা চলে সে পরিপূর্ণা।

সংকলিতা গ্রহণ করলো গুরু দায়িত্ব।

দুর্দশাগ্রস্ত, অনাহার ক্লিষ্ট নরনারী শিশুর মুখে খাদ্য সংগ্রহ করতে এগিয়ে এলো সে।

পাশের এক রাজ্যে গিয়ে হাজির হলো সংকলিতা।

উদ্দেশ্য আহার্যের অনুসন্ধান। গান গেয়ে গেয়ে বেড়াতে লাগলো সেখানে। ক্রমশঃ ভাব জমে উঠলো দেশের কিশোর কিশোরীদের সঙ্গে।

সংকলিতার কাজেও কথায় আকৃষ্ট হয়ে দেশের কিশোর কিশোরীরা তার দলে এসে স্থান নিলো। ওরা ও যে তার সঙ্গে একমত।

সুতরাং কোন শংসয় নেই আর কারো মনে। সবাই এক মত হয়ে সম্মতি দিলো, সংকলিতাকে সাহায্য করবে পাশে থেকে।

এই দল নিয়ে সংকলিতা এসে হাজির হলো দেশের রাজার কাছে। কণ্ঠে তার মিনতির সুর—

এসেছি তাদের তরে মহামানবের দ্বারে।
লাখে লাখে তারা আজ পথের দু'ধার থেকে
মৃত্যু দলিত শবে পথকে ফেলেছে ঢেকে,

চাষী ভুলে গেছে চাষ মা তার ভুলেছে স্নেহ,
কুটিরে কুটিরে জমে গলিত মৃতের দেহ।
উজাড় নগর গ্রামে, কোথাও জ্বলে না বাতি,
হাজার শিশুরা মরে দেশের আগামী জাতি।
রোগের প্রাসাদ ওঠে সেখানে প্রতিটি ঘরে
মানুষ ক্ষুধিত আর শেয়ালে উদর ভরে।
এখনো রয়েছে কোটি মরণের পথ চেয়ে
তাইতো ভিক্ষা মাগি এ দেশে এ গান গেয়ে।

রাজদূত জানালেন মহারাজকে—

প্রজারা সহসা ক্ষিপ্ত হয়েছে যে মহারাজ,
রাজপ্রাসাদের পাশে ভিড় করে আছে যে আজ।

সংকলিতাকে ডাকিয়ে এনে সমাধানের উপায় জানতে চাইলেন মহারাজ। বললেন—

বল মেয়ে তাদের আমি শান্ত করি কি দিয়ে?

সংকলিতা সমাধানের পথ দেখায়—

ধনাগার আজ তাদের হাতে এখুনি দাও ফিরিয়ে।

এই প্রস্তাবে মহারাজ সম্মত হলেন। নিশ্চিন্ত সংকলিতা নিজেও। কিন্তু বাধা দিল কুবের শেঠ। মহারাজকে বোঝালেন দেশে দুর্ভিক্ষ নেই। প্রজারা শুধু শুধু মহারাজকে জ্বালাতন করতে এসেছে। আর যদি প্রজাদের কথাই সত্যি হয় তবে তো তার জন্য দায়ী ওরা নিজেরাই। কারণ তারা ফসল জন্মায়নি।

কুবের শেঠের কথা বিশ্বাস করলেন মহারাজ। অনাহারক্লিষ্ট ক্ষুধিত জনগণের সমস্ত ভার তুলে দিলেন তার হাতে। এ ব্যবস্থায়

স্বার্থান্বেষী কুবের শেঠ পুলকিত হলো। নানা স্তব বাক্যে মহারাজকে সন্তুষ্ট করতে লাগলো।

নাটকের অন্য একটি ন্যায়-পরায়ন চরিত্র ইন্দ্র সেন। পরহিতাকাঙ্খী ও বটে। মহারাজের কাজের জন্য ক্ষুণ্ণ হলো সে।

আশ্চর্য!

মহারাজের একি নির্বুদ্ধিতা! তবু কতোয়ালকে জানালো—

বাঘের ওপর দেওয়া হল ছাগ-পালনের ভার,
কতোয়াল হে তোমার ব্যাপার চমৎকার।

কতোয়াল গর্জে উঠলো কথা শুনে। এত বড় সাহস ইন্দ্র সেনের! তাই রাগত স্বরেই বললো,—

বটে! বটে! বড় যে সাহস
গর্দান-যাবে তবে রোস।

কতোয়ালের ব্যবহারে সংকলিতা বিরক্ত হলো। তাই একটু রাগান্বিত ভাবেই বললো, অপূর্ব তুমি কতোয়াল! তোমার বীরত্ব কিন্তু শোভা পায় না এই ছেলেদের কাছে। কারণ সত্যিকারের যে বীর সে কিন্তু তার যোগ্যস্থানেই বীরত্ব দেখায়। ছেলেদের কাছে যে বীরত্ব দেখায় প্রকৃত পক্ষে সে কাপুরুষ। আর তাতে নাম; সম্মান কিংবা যশ কোনটাই তার ভাগ্যে জোটে না।

মহারাজের লোক কতোয়াল। সুতরাং তার দাপট কম হতে পারে কখনও! তাই মুহূর্তে ক্ষেপে গেল। সংকলিতাকেই দায়ী করলো দুর্ভিক্ষের কারণ হিসাবে।

সত্যকাম আরেকটি চরিত্র নাটকের। সে কিন্তু প্রকৃতই উচিত বক্তা। তাই কতোয়াল কে বাধা দিয়ে সহজভাবেই বললো, অনেকদিন আগেই সংকলিতা এসেছে এদেশে। আশ্চর্য! তখন কিন্তু মন্বন্তর নামেনি এখানে। আজকের এই দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী একমাত্র

কতোয়াল। কারন সে-ই চাষীর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল মজুত করে ডেকে এনেছে এই দুর্ভিক্ষ।

ভীষণ ভাবে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো কতোয়াল।

তার বুঝতে বাকী রইলো না, দেশের লোকের এই সাহস এলো কোথা থেকে। এর মূলে সংকলিতা। সে-ই সাহস জুগিয়েছে, বিক্ষুব্ধ করেছে দেশের লোককে। তাই আর আগের মতো তাকে সম্মান করে না কেউ।

উত্তরে জানালো সংকলিতা, এতে অবাক হবার কি আছে কতোয়াল! দেশের তরুণশ্রেণী তো অন্যায়ের বিরুদ্ধে বরাবরই লড়েছে। আজও লড়ছে। লড়বে আগামী দিন ও।

সংকলিতা আরও সহজ করে বললো—

দরিদ্রের রক্ত করে শোষণ
বিরাট অহঙ্কার কর পোষণ,
তুমি পশু, পাষণ্ড, বর্ব্বর
অত্যাচারি, তোমার হাত কাঁপে না থর থর।

এই অপমান সহ্য করা অসম্ভব দাপটধারী কতোয়ালের পক্ষে। সুতরাং রাগে জ্বলে উঠলো। বললো—

আমাকে বলিস পশু বর্ব্বর?
ওরে দুর্ম্মতি তুই তবে মর।

সঙ্গে সঙ্গে কতোয়ালের হাতে শাণিত তরবারি উদ্ধত হলো। মৃত্যু হলো সংকলিতার। কিন্তু প্রজারা উঠলো ক্ষেপে। করলো বিদ্রোহ। পরে কতোয়াল বন্দী হলো প্রজাদের আদালতে।

অভিযান গীতি-নাট্যের নায়িকা সংকলিতার জনসেবা মূলক কাজের মধ্যে যে চরিত্র ফুঁটে উঠেছে সে যেন বাস্তবের সুকান্ত। যেন সম্পূর্ণ নিজেরই রূপ। দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত নরনারীর জন্য নায়িকার যে আবেদন, সে তো সুকান্তরই আবেদন। সুকান্তও তো নরনারী শিশুর মুখে অন্ন যোগানোর এক গুরু দায়িত্ব নিজের কাধে তুলে নিয়েছিলেন।

পরোপকারী মনোবৃত্তি ছিলো সুকান্তর সবচেয়ে বেশী। অতুলনীয়। তাই দেখা যায় তার সেই পরোপকারকামী মন তাকে আকর্ষণ করেছে দুর্ভিক্ষ এলাকায় নিঃপীড়িত জনগণের পাশে। আবার কখনও দেখা গেছে, অনাহারক্লিষ্ট নরনারীর জন্য খাদ্য সংগ্রহ করতে তাকে ঘুরতে হয়েছে প্রতিটি বাড়ীর দরজায় দরজায়। কখনও বা আর্ত শিশুর আকুল কান্নায় সুকান্ত কোমল মন নিয়ে ছুটেছে দ্বারে দ্বারে দুধ সংগ্রহ করতে। রাস্তার ধারে রোগীকে নিজের হাতে সেবা যত্ন করতে দেখা গেছে। ভিক্ষুককে তার যথার্থ মর্যাদা দিতেন তিনি। কোন কু-সংস্কারই তার দৃষ্টিকে অন্ধ করে দিতে পারেনি কোন দিন। সে যে কল্পনা ও করা যায় না কোনমতে।

না, এ পরোপকার-ব্রতী মন তিনি কারো কাছ থেকে ধার হিসাবে নেননি। জন্মগত অধিকারে পেয়েছেন। সুকান্ত তার দিদিমার কাছে মানুষকে ভালবাসার প্রেরণা পেয়েছিলেন। আর দাদামশায়ের জন্যই সংস্কারহীন সুন্দর মনের অধিকারী হয়েছিলেন তিনি।

আমাদের দেশ বড় দরিদ্র। সুকান্ত দেখলেন এই দারিদ্র্যতার দরুণ বহু ছেলে মেয়েই লেখা পড় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাই তিনি তার কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে ঠিক করলেন ছোট ছোট গরীব ছেলে মেয়েদের জন্য বিনে পয়সার কোচিং ক্লাশ খুলবেন।

সুকান্তর প্রস্তাবে সম্মত হলেন সবাই।

যথা সময়ে কোচিং ক্লাশ খোলা হলো। ক্লাশ ঘর হিসাবে স্থির

হলো সুকান্তদের বাড়ীর পিছন দিকের বারান্দাটাকে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েও জুটে গেল ক্রমশঃ।

এক শুভদিনে শিক্ষাদান পর্ব শুরু হলো।

পড়াশুনো শুরু। রীতিমত ক্লাশ চলতে লাগলো। কিন্তু দেখা গেল পড়াশুনোর থেকে হৈ হট্টগোল হতে লাগলো বেশী।

ক্লাশ বসতো তুপুর বেলা।

হৈ-চৈ গণ্ডগোল যে পরিমাণে চলতে লাগলো তাতে বাড়ীর সকলে হয়ে উঠলেন অতিষ্ঠ। এই যন্ত্রণাদায়ক অশান্তিতে অসহ্য হলেও কেউ বাধা দিতেন না। কারণ সকলেরই ধারণা ছিলো ওদের এই সমাজ কল্যাণকর প্রয়াস তো কয়েকদিনের জন্য মাত্র। বড় জোড় এক মাস।

সত্যি তাই হলো। ধারণা বাড়ীর লোকদের ঠিকই।

মাত্র কয়েক সপ্তাহ ক্লাশ চললো পূর্ণ উদ্যমে। তারপর ধীরে ধীরে কোচিং ক্লাশের আয়ু কমে এলো। ছাত্ররা ও বাড়ী ফিরতে শুরু করলো। পাণ্ডিত্য অর্জন করে যেন ফিরে এলো সবাই।

দিন দিন ছাত্র সংখ্যা কমতে কমতে এক সময় দেখা গেল ক্লাশ ঘরে শুধু অবশিষ্ট রয়েছে মাতুর আর সতরঞ্চি। তবু কিন্তু শিক্ষকরা আশান্বিত। ওরা আবার ফিরে আসবে।

না, এলো না আর একজন ছাত্রও।

শিক্ষকদের প্রতীক্ষার পর প্রতীক্ষা। তারপর একদিন নিরাশ হলেন তারা। ছাত্র সমাগম আর মোটেই হলো না।

একমাসের মাথায় এসে আপনা আপনিই ক্লাশ বন্ধ হয়ে গেল।

এর পর সমাজকল্যাণকর প্রয়াস আরও কয়েকটি হয়ে গেল। কিন্তু তা ফুলে ফলে বর্দ্ধিত হতে পারলো না।

আরও কিছুদিন পরের ঘটনা।

স্থির হলো বেলেঘাটায় 'স্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরী' নামে একটি সাধারণ পাঠাগার স্থাপন করবেন।

১৯৪০ সালের কথা।

অন্যান্যবারের মতো বন্ধুরা এবার ও রাজী হলেন।

পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হলো। বলাই বাহুল্য, এই উদ্যোক্তাদের মধ্যে সুকান্ত ছিলেন অন্যতম এবং সম্পাদক ছিলেন তিনি নিজে। সুকান্ত তার ঐকান্তিক নিষ্ঠা নিয়ে কাজ শুরু করলেন। একজন সহৃদয় বন্ধু সংগ্রহ করলেন একটা ছোট পাইন কাঠের আলমারী। সুকান্ত এবং তার বন্ধুরা তাদের বন্ধু ও আত্মীয় স্বজনদের বাড়ী থেকে বই নিয়ে এলেন।

সুকান্তর মনে এক পণ, যে করেই হোক পাঠাগারের শক্তি বৃদ্ধি করতেই হবে।

সুতরাং তৎপর হয়ে উঠলেন সকলে।

পাঠাগারের পুস্তকের সংখ্যা বাড়াতে হবে। আরও অনেক বই চাই। অতএব শুরু হলো বাড়ী বাড়ী ঘুরে বই সংগ্রহ করা। নিজের বাড়ীর আলমারীও বাদ গেল না এই শক্তি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা থেকে।

আজ বড় আনন্দের কথা যে, সুকান্তর নিজের হাতে প্রতিষ্ঠিত এই 'স্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরী' এখনও সুকান্তর স্মৃতিকে অক্ষয় করে রেখেছে।

সুকান্তর আবির্ভাব ঘটেছিলো ভারতের এক চরম দুর্দিনে।

হ্যাঁ, তাই। জ্ঞান লাভ করবার পর থেকেই তিনি শান্তিতে এবং নিশ্চিন্তে দিন কাটাতে পারেন নি। সামান্যতম শান্তিও তিনি খুঁজে পাননি কোথাও। সত্যি, অবাক হতে হয়।

তিনি তো তার যথার্থ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেছেন, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী প্রদত্ত শাস্তি—বন্যা, দুর্ভিক্ষ এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে। তাইতো সুকান্তর মন বিষিয়ে উঠেছে প্রতিটি মুহূর্তে। তবু আজ ভাবলে বিস্মিত হতে হয়, এত সমস্যার মধ্যে ও কিন্তু তিনি তার আপন সত্বাকে অটুট রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। 'প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসই যেন তাকে সেই গৌরব অম্লান রাখতে দারুণ ভাবে সাহায্য করেছে। একটি মাত্র পথেই তিনি আজীবন চলেছেন। সে পথের মূল কথা সাম্যবাদ।

সুকান্তর যুগ, সাম্রাজ্যবাদের পতনের যুগ। আর সেই যুগে সুকান্ত লক্ষ্য করেছেন, সাম্রাজ্যবাদের জঘন্য রূপকে। ঐ ন্যক্কারজনক রূপ ফ্যাসিবাদ আর নাৎসীবাদ যে গোটা পৃথিবী গ্রাস করতে উদ্যত।

না, সুকান্ত বিভ্রান্ত হননি। হতাশ হননি।

তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো, শ্রমিক কৃষকের ও প্রগতিশীল মানুষের প্রচণ্ড আঘাতে ফ্যাসিবাদ কিংবা নাৎসীবাদ যাই হোক একদিন তা ভেঙ্গে চৌচির হবেই। চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে বাধ্য। নইলে যে মিথ্যা হয়ে যায় ইতিহাস।

সুকান্ত উপলব্ধি করেছিলেন, দেশের কালো বাজার এবং দুর্ভিক্ষ, ফ্যাসিবাদ এবং মৃত্যু সে যে একই সুরের মুর্চ্ছনা।

আরও গভীরে এলেন সুকান্ত। আরও ভাল করে লক্ষ্য করলেন, জমিদারী, আড়তদারী, জোতদারী ও মহাজনীকে। না, দেখতে ভুল হলো না তার। তিনি বুঝতে পারলেন যে এ সবই সাম্রাজবাদীদের দ্বারাই সৃষ্টি হয়েছে। আর এর ফল হিসাবে দেখা গেছে দেশ জুড়ে হাহাকার, সঙ্কট, হতাশা।

অবাক হলেন সুকান্ত।

আশ্চর্য! কত দিন চলবে আর এই রকম! এই ফ্যাসিবাদী আক্রমণ কতদিন দেশকে সঙ্কট পূর্ণ করে রাখবে!

না, এই অবস্থাকে বেশীদিন জিয়িয়ে রাখা উচিত নয়। দীর্ঘদিন

চলতে পারে না। কারণ জমিতে যাদের কোনদিনও চরণ স্পর্শ হয়নি, তাদের জমিদার বলা হয় কোন অর্থে? আর জনগণকে যারা পীড়ন করে, শোষণ করে তাদেরইবা কোন পদ্ধতিতে মহাজন বলা হয়?

না, এ সম্পূর্ণ অর্থহীন।

সুকান্তর মন বিদ্রোহ করে। চাষীর হাতে জমি চাই। জমিদার আড়তদার, জোতদার, মহাজন এসব চাটুকধারী শব্দ মাত্র। এ সব প্রথার অবসান চাই। আর চাই তার জন্য আন্দোলন। গণ-আন্দোলন। সেই তো প্রকৃত গণতান্ত্রিক আন্দোলন হবে।

সর্বপ্রথম হঠাতে হবে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারকে। নইলে যে শ্রমিক কৃষকের উপর অবাধ শোষণকে বন্ধ করা যাবে না। দেশের ফুলে ফেপে উঠা এক চেটিয়া পুঁজিপতিরা বিভিন্ন সঙ্কটকে উপলক্ষ্য করে আরও ফেপে উঠবে। এরাই তো নিজেদের স্বার্থের জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে মিলে দেশের বিপক্ষে কাজ করবে। হাত শক্ত করবে তাদের। সুতরাং আগে তাড়াতে হবে সাম্রাজ্যবাদীকে।

গণতান্ত্রিক আন্দোলনের যুদ্ধা ছিলেন সুকান্ত। তিনি বিশ্বাস করতেন, দেশের সাধারণ মানুষকে কোন সরকার দীর্ঘদিন দাবিয়ে রাখতে পারে না। আর ইতিহাসও তো সে কথা বহুবার প্রমাণ করেছে।

তাই সুকান্ত বিদেশী সরকার দ্বারা রাজনৈতিক শাসনও অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। নানা বিপ্লবে সামিল হয়েছিলেন। এই শাসনও শোষণকে হটিয়ে ভারতে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অংশিদার হিসাবে নিজেকে কমিউনিস্ট দলের কর্মে নিয়োজিত করেছিলেন। কারণ সুকান্ত যে বিশ্বাস করতেন একমাত্র লক্ষ্য স্বাধীনতাকে অর্জন করতে হলে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের লড়াই ভিন্ন পথ নেই। তাই তিনি চেয়েছিলেন শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের মধ্যে দীর্ঘ মৈত্রী।

সব চেয়ে বড় কথা সুকান্ত একজন কবি। তিনি বিরাট প্রতিভা নিয়ে জন্মে ছিলেন। সত্যি, সে প্রতিভা দেখলে অবাক হতে হয়।

কারো কারো ধারনা, এমনকি অপবাদ পর্যন্ত দিয়ে থাকেন যে সুকান্তর কাব্যে রয়েছে কেবল পার্টির কথা আর শ্লোগান। আবার রাজনীতির আসরে ঢুকে সুকান্ত কবি হতে পারলেন না—এ ধরনের কথাও কেউ কেউ বলেন। যারা এই ধরনের মন্তব্য করেন, তারা কি সুকান্তর সত্যিকারের রূপটি একটু তলিয়ে দেখতে চান না!

একটু তলিয়ে দেখলে সব ধাঁ-ধাঁ স্বচ্ছ হয়ে যাবে। কারণ তিনি যে যুগের কবি সে যুগের ছবিটা পরিষ্কার করে দেখতে হবে। তবেই সম্ভবত সুকান্তর কাব্যে দিনবদলের সত্যিকারের কারণটি খুঁজে পাবেন। যথার্থ ভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন। সুকান্তর যুগ যে সাম্রাজ্যবাদের পতনের যুগ বলে চিহ্নিত।

আবার অনেকাংশে দেখা যায় যে তার সমালোচকরা বার বার প্রমাণ করতে চেয়েছেন, সুকান্ত দরিদ্র ছিলেন। সুতরাং তার চিন্তাধারায় এবং লেখায় সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অভাব-অনটন ও ব্যথা-বেদনার কথাই বেশী করে রূপ পেয়েছে। যদি না ব্যক্তিগত জীবন ঐ ধরনের হতো, তবে নিজেকে নিপীড়িত মানুষের পাশে তিনি এমন ভাবে কখনও দাঁড় করাতে সক্ষম হতেন না।

না, একথাও সত্যি নয়। কারণ হিসাবে, বাংলার অনেক কবিই দরিদ্র। তবে তারা কেন নিজেদের নিষ্পেষিত জনগণের পাশে দাঁড় করাতে পারেননি? বরং দেখা গেছে, তারা বরাবরই বিচরণ করেছেন কল্পনার স্বর্গরাজ্যে। সুতরাং এ যুক্তিও যথার্থ নয়।

কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ণসদস্য ও একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন সুকান্ত। একেবারে ছোটবেলা থেকেই যেন তিনি একটু স্বতন্ত্র প্রকৃতির। পরে ভালভাবে জ্ঞান হওয়ার পর হতেই ধীরে ধীরে পরিচয় হয় কমিউনিস্ট নীতি ও কার্য কলাপের সঙ্গে।

সুকান্তর মন চঞ্চল হয়ে উঠে।

না, বিলম্ব নয়, সুকান্ত মনের তাগিদে নিয়মিত ভাবে যাতায়াত করতে থাকেন বেলেঘাটার অফিসে। দীর্ঘদিন যাতায়াতের ফলে তিনি একে একে পার্টির অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে পরিচিত হলেন। মনপ্রাণ দিয়ে তিনি নিজেকে পার্টির কাজে লাগাতে চান। কিন্তু সে সুযোগ পাওয়া তার পক্ষে হয়ে উঠলো দুরূহ। পার্টি অফিস থেকে তাকে স্বীকৃতি দিতে চান না। তাকে জানিয়ে দিলেন, ষোল বছর বয়সের কাছাকাছি কোন ছেলেকে সদস্য করা হয় না।

এদিকে সুকান্তও পিছু হটতে রাজী নন। আর হটবেনইবা কেন! সুতরাং শুরু হলো অনেক কথা কাটাকাটি, তর্ক-বিতর্ক। যুক্তির পর যুক্তি দেখালেন সমস্ত বিষয়ে।

এরপর সুযোগ এলো। সুকান্ত তার যুক্তি দ্বারা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বোঝাতে সক্ষম হলেন। সুতরাং স্বীকৃতি এবং সুযোগ পেলেন রাজনীতির কাজে আত্মনিয়োগ করার। আর সুকান্ত সুযোগ পেয়ে যেন ধন্য হলেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র তখন তিনি। সে সময়ে এত কম বয়সে রাজনীতিতে কেউ যোগ দিতে যেতেন না। কিন্তু সুকান্তর বয়স কম হলে কি হবে, দৈনিক পুরানো কাজের হিসাব দিয়ে নতুন কার্যভার গ্রহণ করতে অন্যান্য কর্মীর মতো তিনিও হাজির হতেন পার্টি অফিসে। প্রতিদিন নিয়মিতভাবে কাজ করতেন। না, কাজ করতে গিয়ে কখনও তিনি ক্লান্তি বোধ করেন নি। হতাশ হননি।

পার্টিতে সর্বকনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন তিনি। সেজন্য সকলেই তাকে ভালবাসতেন খুব। বিভিন্ন ভাবে উৎসাহ দিতেন। ভাল করে বুঝতে দিতেন কার্যপদ্ধতির সমস্ত ধারাগুলো। না, সুকান্তর কোন অসুবিধাই হতো না সেগুলো বুঝতে। তাই খুব অল্প সময়ের মধ্যেই নিজের কাজ নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন তিনি। কখনও বা কাজ পড়তো পার্টি

অফিসে। আবার কখনও বা তিনি লিখতেন পোস্টার। শুধু লেখাই নয়, সময়েতে সেই পোস্টার আর আঠার পাত্র নিয়ে তাকে ছুটতে হতো পথে পথে, এক দেওয়াল থেকে অন্য দেওয়ালে, এক কারখানার গেট থেকে অন্য কারখানার গেট পর্যন্ত পোস্টার আঁটতে। শুধু লিখলেই কি হবে, যদি লেখা পোস্টারগুলো জনসাধারণের চোখের সম্মুখে তুলে না ধরা গেল তবে লেখার স্বার্থকতা কোথায়!

সুকান্তকে অনেক সময় দেখা গেছে লেবেল আঁটা কৌটো নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে চাঁদা সংগ্রহ করতে। না, কোন সংকোচ, লজ্জা কিংবা দ্বিধায় তাকে তার পথ থেকে বিন্দুমাত্র সরিয়ে আনতে পারেনি। কাজ করতে গিয়ে কখনও হাঁপিয়ে উঠেন নি।

ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়ার সময় কোথায়! তিনি যে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষের লড়াইয়ে নিয়োজিত করেছিলেন। ফ্যাসিবাদকে ধ্বংস করে সাম্যবাদের মন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য মনেপ্রাণে খেটে চলেছেন। তাইতো নিজেকে পুরোপুরি ভাবেই পার্টির সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছিলেন।

বেলেঘাটা অফিসে কাজ ছিল বেশী। কিন্তু কর্মীসংখ্যা সে তুলনায় খুবই কম। না, সুকান্ত তাতেও দমে যাননি। তিনি সে অভাবও দূর করেছিলেন। ছুটোছুটি করে দুই তিনজনের কাজ তিনি একাই প্রচুর পরিশ্রম করে সেরে ফেলতেন।

সুকান্ত বুঝেছিলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সৈন্যের খাদ্য যোগাতে গিয়ে ভারতে দেখা দিয়েছিলো প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ। আর ফলস্বরূপ অনাহারক্লিষ্ট অসহায় মানুষ পঙ্গপালের মতো দলে দলে মৃত্যুর নির্মম ক্রোড়ে স্থান পেয়েছিলো। এই দুর্ভিক্ষ বৃটিশ সরকার ইচ্ছাকৃত ভাবে তৈরী করেছেন। সে সময় কমিউনিস্টপার্টি গিয়ে দাঁড়ালো অনাহারক্লিষ্ট অসহায় নরনারীর পাশে। পার্টির কর্মীরা ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় চাঁদা তুললেন। সেখানেও দলের প্রথমে দেখা যেতো সুকান্তকে। নিজের অভাব-অনটন যথেষ্ট পরিমাণে

থাকা সত্বেও কেউ কখনও তাকে কোন সুযোগ নিতে দেখেন নি। কিন্তু অন্যের অভাবের কথা শুনলে তিনি যতক্ষণ না সে প্রয়োজন মেটাতে পারেন ততক্ষণ পর্যন্ত তার মন শান্ত হতো না।

কতগুলো বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিলো এই সময়ে। এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে বলা হতো সমাজ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান। এদের কাজ ছিলো বিভিন্ন মহল্লায় মহল্লায় ঘুরে প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া স্থানীয় লোকদের মধ্যে। সুকান্ত ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানেরও সদস্য। তিনি এই ধরণের বহু সংগঠনের সঙ্গেই নিজেকে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ফেলেছিলেন।

কুসুম-কোমল স্বভাব ছিলো সুকান্তর। কেউ কখনও বড় একটা তাকে রাগান্বিত অবস্থায় দেখেননি। মুখ বন্ধ করে একমনে তিনি নিজের কাজ করে যেতেন। যেন এক আপনভোলা কবি, আপনভোলা কর্মী। এই হেন লোককেও মাঝে মধ্যে রাগে বারুদের মতো জ্বলতে দেখেছেন কেউ কেউ।

কমিউনিস্ট পার্টি ছিলো যেন সুকান্তর প্রাণ। একবার তার একবন্ধু রসিকতা করতে গিয়ে পার্টিকে ছোট করেছিলেন। সেই অপমান তার মনে খুব বেশী করে লাগলো। পার্টির অপমান তার নিজের অপমান। সুতরাং মুহূর্তের মধ্যে ক্ষেপে উঠলেন। চোখ দুটি তার লাল রক্তজবার মতো হয়ে গেল। রাগের সঙ্গেই বন্ধুটিকে ঘার ধরে ঘর থেকে বার করে দিলেন। না, তিনি কারো কোন নিষেধ শুনেন নি। অনুরোধও নয়। এমনি মজবুত ছিলো সুকান্তর চরিত্র।

পার্টির প্রতি দারুণ নিষ্ঠা ছিলো সুকান্তর।

নিজের স্বার্থে তিনি ছিলেন সর্বদাই অসম্ভব লাজুক। তাই কখনও তাকে কারো কাছে হাত-পাত্‌তে কিংবা অন্য কারো দয়া অথবা সাহায্য নিতে দেখা যায়নি। পার্টির স্বার্থ অথবা দেশের মানুষের স্বার্থের কাছে সুকান্তর ব্যক্তিগত স্বার্থ ছিলো নগণ্য। একবার

'ছাত্র ফেডারেশনের' আহ্বানে কোলকাতার বাইরে এক বিরাট জনসমাবেশে যোগ দিয়েছিলেন তিনি।

তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। ফেরার পথে ভীষণ ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় ক্লান্ত হয়ে পড়লেন তিনি। তার কাছে একটাও পয়সা নেই যে তিনি খেতে পারেন। হঠাৎ পকেটে হাত দিয়ে দেখলেন একটি টাকা রয়েছে। তুলতে গিয়েও থমকে গেলেন তিনি। সহসা মনে পড়ে গেল, ঐ টাকাটা পার্টির চাঁদা হিসাবে তার এক দূর সম্পর্কের দাদার কাছ থেকে নিয়েছিলেন। সুতরাং সে টাকা খরচ করা চলে না। তাই সমস্ত পথ তিনি রেল কম্পানীর জল পান করে কোলকাতায় ফিরে ছিলেন। ক্ষুধায় এ রকম কষ্ট ভোগ না করে তখনকার মতো কাজ চালিয়ে পরে তার সুবিধা মতো টাকাটা পাটি অফিসে জমা দিতে পারতেন। না, সুকান্ত তা করেননি। ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটাতে তিনি পার্টির টাকা খরচ করতে নারাজ। পার্টির প্রতি এহেন নিষ্ঠার বুঝি তুলনা হয় না।

পার্টির কর্মী হয়েই যেন কবি সুকান্ত তার জীবনের পরিপূর্ণতা লাভ করেছেন। যেমন কবি মায়াকভস্কি তার কবিতার দ্বারা জাগিয়েছিলেন পার্টিকে। দেশের শ্রমিক কৃষককে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন এক নতুন চেতনায়। তার কবিতায় বজ্রনির্ঘোষ ভাষায় যেমন আতঙ্কিত করেছিলেন দেশের ধনী বুর্জোয়াদের, মজুতদারদের, শাসক শ্রেণীকে সুকান্তও তো ঠিক সে ভাবেই বারংবার বিশ্বের সমস্ত সমাজ বিরোধীদের হুঁশিয়ার করেছেন কবিতায় গুরুগম্ভীর বিদ্যুৎচ্ছটা প্রকাশ করে। গোটা বিশ্ববাসীর চোখে চমক লাগিয়েছেন তিনি তার কাব্যের অগ্নিস্ফুলিঙ্গে। তাই রাশিয়া, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে সুকান্ত বেঁচে থাকতেই তার কবিতা নিয়ে হৈ-হুল্লোড় পড়ে গিয়েছিলো। তারা মুগ্ধ হয়েছিলেন কবির বিরাট প্রতিভা দেখে। সুকান্তর কবিতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেদের ভাষায় অনুবাদও করেছেন তার জীবিত অবস্থাতেই।

দেশের নিপীড়িত, দীর্ঘদিন মালিক, মজুতদার, জোতদার ও মহাজনদের সমবেত অত্যাচারে জর্জরিত, শোষিত মানুষের সঙ্গে মিশে যাওয়ার সুযোগ আসে পার্টির দৌলতেই। আবার পার্টির কল্যাণেই কবি সুকান্ত দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের আঘাতের প্রতিকারের উপায় কি এবং কিরূপ তা জানাতে সুযোগ পেয়েছিলেন। সমাজ কল্যাণকর প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন তিনি।

তাই সুকান্ত শোষিত, নিঃশ্বেষিত জনগণকে শোনাতে পেরেছেন তাদের মর্মবেদনার ইতিহাস। তিনি যে জনগণের কবি। দেশের দুর্দিনে দুর্গতদের সাথে একাত্ম হয়ে অনুভব করেছেন সব। সে জন্যই তার কিছুটা প্রমাণ পাওয়া যায় তার অনুভব (১৯৪৬) কবিতায়—

> প্রত্যহ যারা ঘৃণিত ও পদানত
> দ্যাখো আজ তারা সবেগে সমুদ্যত ;
> তাদের দলের পিছনে আমিও আছি,
> তাদেরই মধ্যে আমিও যে মরি বাঁচি।

সুকান্ত পাটিকে ভালবেসেছিলেন অন্তরের সবটুকু শ্রদ্ধা উজাড় করে দিয়ে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস পাটির জন্য তিনি অক্লান্ত-ভাবে কাজ করে গেছেন। পাটিই তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো—দিনের বিশ্রাম আর রাতের ঘুম।

অধিকাংশ দিনই বাড়ীর লোকেরা জানতে পারতেন না, সুকান্ত রাতে বাড়ী ফেরেন কখন! গভীর রাতে বাড়ী ফিরে কোন কোন দিন ঢাকা দেওয়া খাবার পেতেন, আবার কোন কোন দিন বা দেখতেন তার আহার্য পচে ফেনা উঠে দুর্গন্ধ ছড়াতো। অনেকদিনই বাড়ী ফিরে দেখেছেন, তার খাবারের ঢাকনা ফেলে বিড়াল সেগুলো খেয়ে গেছে। ফলে সুকান্তকে বহু রাত্রিই কয়েক গ্লাস জল খেয়ে ক্ষুধা দমন করতে হতো। দিনের খাবারের ও কোন নির্দিষ্ট সময় ছিলো না।

প্রায়ই তাকে দেখা যেতো, পশ্চিমে যখন সূর্য হেলে ডুবু ডুবু হবার উপক্রম তখন তিনি খেতে বসতেন।

১৯৪৩-এর যুগ সন্ধিক্ষণ।

ভারতের আকাশে জাপানী বিমান ঘন ঘন দেখা দিতে লাগলো। চলতে লাগলো দুঃসহ বিমানের মহড়া। সময়ে অসময়ে সাইরেনের আর্তনাদ শুরু হলো। মৃত্যু ভয়ে প্রতিটি মুহূর্ত গুণছে ভারতবাসী। সাম্রাজ্য লিপ্সু জাপান বেপরোয়া ভাবে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে ছুটে এসেছে। ঘন ঘন বোমা বর্ষণ করছে চট্টগ্রামের উপর। তার শরীরকে বুঝি ক্ষত বিক্ষত করে দিতে চায় তারা। কিন্তু যিনি সাম্যবাদের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করেন, তিনি কি সাম্রাজ্য লিপ্সু জাপানের এই মর্মন্তুদ অত্যাচারকে ক্ষমার চোখে কখনও দেখতে পারেন? না, স্বীকৃতি দিতে পারেন? অসম্ভব।

চট্টগ্রামের ইতিহাস মহান। চট্টগ্রামের যত গ্লানি সে তো অনেক শহীদ রক্তের বিনিময়ে ধুয়েমুছে পরিষ্কার করেছিলেন। একদিন নিরীহ শিক্ষক সূর্য সেনের নেতৃত্বে এই চট্টগ্রাম বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিলো। গর্জে উঠেছিলো। ব্রিটিশ সরকারকে উচ্ছেদ করতে দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ করেছিলো। রচিত হয়েছিলো অভাবনীয় ইতিহাস। ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রাম মুক্ত হয়েছিলো। স্বাধীন হয়েছিলো।

এই যুগ সন্ধিক্ষণে চট্টগ্রামের উপর বিমান মহড়া দেখে পূর্বের স্মৃতি জেগে উঠে। তাই তো সাম্যবাদী কবি সুকান্ত লিখলেন লাঞ্ছিত চট্টগ্রামকে উদ্দেশ্য করে।

> বিক্ষত বিধ্বস্ত দেহে অদ্ভুত নিঃশব্দ সহিষ্ণুতা
> আমাদের স্নায়ুতে স্নায়ুতে
> বিদ্যুৎ প্রবাহ আনে আজ চেতনার দিন।

চট্টগ্রাম বীর চট্টগ্রাম !
এখনও নিস্তব্ধ তুমি
তাই আজো পাশবিকতার
দুঃসহ মহড়া চলে,
তাই আজো শত্রুরা সাহসী।

সেদিন বিপ্লবী সূর্য সেন সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের আইনে দণ্ডাজ্ঞা পেলেন ফাঁসি। কিন্তু তরুণ সমাজ? না, তখন বিক্ষুব্ধ তরুণরা উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। তারা জেগে উঠলেন নতুন শক্তি নিয়ে। বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে দিলেন তারা ঢাকা, ফরিদপুর, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে। কণ্ঠে ছিলো তাদের দৃঢ় শপথ ধ্বনি—

তোমার প্রতিজ্ঞা তাই আমার প্রতিজ্ঞা, চট্টগ্রাম।
আমার হৃৎপিণ্ডে আজতারি লাল স্বাক্ষর দিলাম।

সাম্রাজ্য লিপ্সু জাপানী বোমারু বিমান যখন দাম্ভিক গতিতে উড়ে বেড়াচ্ছে তখন ভারতের মুষ্টিমেয় বিবেক-বুদ্ধিহীন ফ্যাশিস্ট তাকে স্বাগত জানালো অন্ধ সমর্থনে। তাদের বদ্ধ মূল ধারণা দীর্ঘপথ অতিক্রম করে জাপান আসছে ভারতকে স্বাধীনতা প্রদান করতে। কিন্তু সাম্যবাদীরা একে সদুদ্দেশ্য বলে ভাবতে পারলেন না। বিক্ষোভ দেখালেন। চীনা সৈন্যরা বীরত্বের সঙ্গে স্বৈরাচারী জাপানীর পথ রোধ করছিলো। অতএব চীন অঘটন ঘটালো তাদের মতে। নইলে শত শত জাপানী বিমান এসে ইংরেজ নিধন করে মন্ত্রশক্তির মতো ভারতকে স্বাধীন করে দিয়ে নিজ দেশে ফিরে যেতো। সুকান্ত এই ধরনের হতভাগ্য ফ্যাশিস্ট সমর্থকদের উদ্দেশ্য করে তাদের ভ্রান্ত ধারণা সম্পর্কে ব্যাঙ্গ কবিতা লেখেন—

…আমাদের যখন দরকার
জাপান সরকার
ইংরেজ নিধনকারী পাঠাবে সৈনিক ;

কিন্তু ক-টা অবাধ্য চৈনিক অন্তরায়
আমাদের স্বরাজ পাওয়ায়।
আর অন্তরায় শুধু সাম্যবাদী দল
স্বাধীনতা দেওয়া নাকি জাপানির ছল!…

সুকান্ত ছিলেন সাম্যবাদের একনিষ্ঠ সাধক। এই কবিতা থেকেই তার পরিচয় পাওয়া যায় আন্তর্জাতিক মনোভাব সম্বন্ধে।

১৯৪৪ সাল। বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত কোলকাতা নগরী। চারিদিকে সমানে চলেছে তাণ্ডব লীলা। মানুষের জীবন যাত্রা ব্যাহত। দিনের বেলা তবু পথে লোকজন বেরুতো নিজের প্রয়োজনের তাগিদে। কিন্তু সন্ধ্যার পূর্বেই ফিরে আসতে বাধ্য হতো তারা। ব্ল্যাক-আউটের রাত। না, আলো জ্বালাবার কোন উপায় নেই।

কোন বিশেষ প্রয়োজনেও মানুষের আলো জ্বালার ক্ষমতা ছিলো না। অন্ধকারে আদিম জীবন যাপন করতে হতো। এমনি এক দুর্যোগপূর্ণ ব্ল্যাক-আউটের সময়ে ঠিক হয়েছিলো সুকান্তর অগ্রজ শ্রীসুশীল ভট্টাচার্যের বিয়ের দিন। সময় মতো বিয়ে হলো। ব্ল্যাক-আউটের অন্ধকারেই বাড়ীতে নববধূর আগমন হলো। সুকান্ত স্থির করলেন নতুন বৌদিকে একটি কবিতা উপহার দেবেন। লিখলেন—

এ-শহর নিষ্প্রদীপ, নিষ্প্রদী আমাদের ঘর
জমেছে উদাস ধূলো অনাদৃত বৎসর বৎসর।
এখানে কখনো কেউ পায়নিকো বসন্তের হাওয়া
তাই তো এখানে ব্যর্থ সহৃদয় চাওয়া আর পাওয়া।
বাঁচার আতঙ্ক স্পষ্ট, দারিদ্র্য অবগুণ্ঠিত
সন্ত্রাস ফুলের গন্ধ, এখানে চাঁদও কুণ্ঠিত

বুভুক্ষায় পিষ্ট আশা, তিরোহিত নিষ্ফল নিঃশ্বাসও
একটি প্রদীপ এনো এখানে কখনো যদি আসো।

যুদ্ধোন্মত্ত পৃথিবীর নগ্ন রূপ দেখা যায় কবিতাটিতে। আর পাওয়া যায় বাড়ীর আবাল্য স্নেহ বঞ্চিত সুকান্তর সংসারের করুণ বর্ণনা। হ্যাঁ, তা নিয়েই লিখলেন কবিতা।

কিন্তু এক সমস্যা দেখা দিলো কবিতাটি দেওয়া নিয়ে। এ যে লজ্জার কথা। মনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব চললো অনেকক্ষণ ধরে। না, শত লজ্জা এসে তাকে অবগুণ্ঠিত করে ফেললো। সুতরাং সুকান্তর ইচ্ছা আর পূরণ হলো না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমসাময়িক সময় সুকান্তর কবি প্রতিভাব নতুন রূপ প্রকাশ পায়। পৃথিবীর ব্যথা বেদনার প্রতিচ্ছবি তিনি যেন তার দৃষ্টিতে দেখতে পেলেন যুদ্ধোন্মত্ত কালে। জনগণের দুর্দশাগ্রস্ত মুখ দেখে তিনি দুঃখ পেয়েছেন প্রাণে। যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করেছেন।

দুর্ভিক্ষ মহামারী এবং বিশ্বব্যাপি যুদ্ধ বিক্ষুব্ধ করেছিলো সুকান্তকে। তাই ন্যায়ের মূর্ত প্রতীক কবি কি করে অন্যায়ের রাজত্বকে বরদাস্ত করবেন! না, সম্ভব নয়। বার বার বুঝি তাই তার কবিতায় নির্দয় চাবুককে তিনি সংযত করতে পারেন নি।

হতাশার প্রতিধ্বনি কবি হৃদয়কে উত্যক্ত করলেও তিনি যেন আশান্বিত। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন, হতাশা চিরস্থায়ী নয়। কাল রাত্রির অন্ধকার একসময় কেটে যেতে বাধ্য। বরং তার স্থানে সোনাঝরা রৌদ্রের ঝিল্‌মিল্ আলোতে জাগবে নতুন প্রাণ। ফুটবে মরশুমের ফুল। সে সময়ের বুঝি আর দেরী নেই। অত্যাচারী ফ্যাসিবাদের দম্ভ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে লুটিয়ে পড়বে এক সময়। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন প্রত্যেকেরই সমবেত প্রয়াস। হৃদয়ের ঐকান্তিক স্পৃহা।

সুকান্ত জানেন. বাংলার প্রতি ঘরে ঘরে রয়েছে সুপ্ত আগ্নেয়গিরি। শুধু জাগিয়ে তোলার অপেক্ষামাত্র। তাই তাদের মধ্যে আনতে হবে সর্বাগ্রে ঐক্য এবং নিষ্ঠা। ওদের সুপ্ত চেতনা যখন জাগবে, তখন গোটা বিশ্ব মুগ্ধ হয়ে দেখবে—তাদের ভিতর রয়েছে কি প্রচণ্ড শক্তি আর দুর্দান্ত ক্ষমতা।

তাইতো সুকান্ত ভবিষ্যতের ইংগিত বহনকারী কিশোর কিশোরীদের নতুন করে উদ্বুদ্ধ করতে অক্লান্ত প্রচেষ্টায় গড়ে তুলেছিলেন 'কিশোর বাহিনী'। সাড়াও পেলেন অভূতপূর্ব রূপে। পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষে স্বার্থপরতা ও শোষণ সংক্রামক ব্যাধির মতো মানুষের মনকে করে তুলেছিলো দূষিত। এই দূষিত আবহাওয়া থেকে কিশোর-কিশোরীদের অব্যাহতি দিতেই কিশোর বাহিনীর সৃষ্টি।

গড়ে উঠলো কিশোর বাহিনী।

সারা বাংলায় তখন কিশোর বাহিনা সংগঠনের কাজে ব্যস্ত। শহরে, গ্রামে সর্বত্রই গঠিত হতে লাগলো অসংখ্য কিশোর বাহিনী। সুকান্তর এই মহৎ প্রচেষ্টায় উৎসাহিত হয়ে এমন কি গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ও কিশোর বাহিনী গঠিত হলো। প্রায় ত্রিশ থেকে প্রয়ত্রিশ হাজার কিশোর-কিশোরী বিভিন্ন বাহিনীতে যোগ দিলো।

কিশোর বাহিনী গড়ার হিড়িক তখন খুব জোর চলছে। বাংলার কিশোর বাহিনীর প্রচেষ্টায় প্রণোদিত হয়ে বাংলার বাইরে ও বহু সংগঠন গড়ে উঠতে লাগলো।

আর সুকান্ত?

সুকান্ত তখন ভবিষ্যতের ইংগিত বহনকারী কিশোর কিশোরীদের এক নতুন সূত্রে পবিত্র মন্ত্রে বেধে নতুন দিনের সন্ধান দেবার জন্য আপ্রাণ খেটে চলেছেন। বিভিন্ন সংগঠনে পরিচালকমণ্ডলী নিয়মিত ভাবে কিশোর কিশোরীদের সুস্থ ও সবল স্বাস্থ্য গঠনের জন্য বাংলার নানা ধরনের খেলাধূলার ব্যবস্থা করেছিলেন। আর দেওয়া হতো সমাজ সেবা মূলক কাজে উৎসাহ! পরাধীনতার গ্লানি দূর করতে

হবে। ভারতমাতাকে মুক্ত করতে হবে সাম্রাজ্যবাদীদের নাগপাশ ছিন্ন করে। এই সুকঠিন কাজে কিশোর-কিশোরীদের উৎসাহিত করে চললেন সুকান্ত।

তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, যাদের পেটে প্রতিনিয়ত জ্বলছে ক্ষুধার আগুন, যাদের দেহে সামান্য বস্ত্র নেই লজ্জা নিবারণের জন্য, ভোর হতে না হতেই যাদের চাল, চিনি, তেল প্রভৃতি সংগ্রহের জন্য ছুটতে হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা এবং প্রতিক্ষা করতে হয় রোদ বৃষ্টিকে অগ্রাহ্য করে, আর যাদের মনকে দুর্বিষহ করেছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও বোমার প্রচণ্ড শব্দে তাদের কাছে কল্পনার স্বর্গরাজ্যের ফানুস উড়িয়ে কিংবা রূপকথার গল্প বলে মন ভোলানোর অর্থ প্রবঞ্চনা ভিন্ন কিছুই নয়।

কিশোর বাহিনীর এই উদ্দেশ্য শহর থেকে গ্রামে পৌঁছে দিতে প্রয়োজন সংবাদ পত্রের। সুতরাং স্বাধীনতা পত্রিকায় খোলা হলো 'কিশোর সভা' বিভাগ। আর এই বিভাগটির পূর্ণ দায়িত্ব এসে পড়লো সুকান্তর উপর। তিনি দায়িত্বভার গ্রহণ করে বিভাগটির সম্পাদকের পদ লাভ করলেন। শুধু সুকান্তর লেখাই নয়, তার ঐকান্তিক নিষ্ঠায় তখনকার কবি সাহিত্যিকদের জড়ো করেছিলেন দেশের কিশোর কিশোরীদের কোমল মনকে নতুন মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে কুসংস্কারের সংক্রামক ব্যাধির হাত থেকে দূর করতে।

এই স্বাধীনতা পত্রিকাটিকে সুকান্ত খুব ভালবাসতেন। তাই পত্রিকাখানির উন্নতির জন্য তার দান ছিলো ভীষণ গভীর এবং অত্যাধিক ব্যাপক ধরণের। যেমন কিশোর সভার পাতাটিকে সুষ্ঠ ও সবল করে সম্পাদনা করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হতো, ঠিক আরেকটি কাজ ছিলো নিজ হাতে কাগজ বিক্রি করা। না, কোন লজ্জা কিংবা সংকোচ তার ছিলো না। তিনি দৃঢ় চিত্তে কখনও শিয়ালদহ, কখনও হাওড়া ষ্টেশনে, আবার তাকে কোলকাতার রাস্তায় রাস্তায় এবং পাড়ায় পাড়াও কাগজ বিক্রি করতে দেখা গেছে। না, কখনও দ্বিধা দেখা যায়নি তার চোখেমুখে।

১৯৪৪ সালের ৭ই অক্টোবর। তখন কিশোর বাহিনীর কেন্দ্রিয় অফিস ছিলো, ৮২নং ভবানী দত্ত লেনে। কিশোর বাহিনীর সঙ্গে সুষ্ঠভাবে পরিচয় লাভের জন্য এই কেন্দ্রিয় অফিস থেকে বাংলার কিশোর বাহিনীর উদ্দেশ্যে লেখা নীচের চিঠি থেকে কিশোর বিভাগ সম্পাদনার ক্ষেত্রে সুকান্তর চিন্তা ধারার যথেষ্ট পরিচর পাওয়া যায়।

"প্রিয় বন্ধু,

তোমরা কি ধরণের কাজ করবে জানতে চেয়েছ, জানাচ্ছি। তোমরা প্রথমে নিজেদের লেখা পড়া ও আচার ব্যবহার, চরিত্রের উন্নতির দিকে নজর দেবে। নিজেদের স্বাস্থ্য ও খেলাধূলার দিকেও নজর দেবে সেই সঙ্গে। তোমরা গরীব ও অসুস্থ ছেলেদের সব সময় সাহায্য এবং সেবা করার চেষ্টা করবে, নিজেদের লেখাপড়ার উন্নতির জন্য প্রাণপণ খাটবে।"

এ সময়ে একবার এক মজার ঘটনা ঘটেছিলো।

অরুণাচল বসু কোলকাতা থেকে বহুদূরে যশোরের গ্রামে থেকেও সুকান্তর সঙ্গে এবং তার পরিচালিত কিশোর বিভাগ ও কিশোর বাহিনীর সঙ্গে গভীরভাবে যোগাযোগ রেখে চলতেন। তখন তিনি কিশোর সভার পাতায় মাঝে মাঝে ছবি ও কার্টুন এঁকে পাঠাতেন। তার আঁকা প্রতিটি চিত্রের নীচে 'অ' স্বাক্ষর থাকতো। সুকান্ত তাকে চটাবার জন্য দেবব্রত মুখোপাধ্যায়কে (ছদ্মনাম অহিনকুল মুখোপাধ্যায়) দিয়ে একটা কার্টুন আঁকিয়ে তাতে অবিকল অরুণাচলের মতো 'অ' চিহ্ন দিয়ে কিশোর সভার পাতায় ছেপে দিলেন। অরুণাচলের হাতে যথাসময়ে কাগজ পৌছালে তিনি ক্ষেপে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে কৈফিয়ৎ দাবী করে চিঠি পাঠালেন সুকান্তর কাছে। উত্তরে সুকান্ত জানালেন—

"স্বামী অরুণাচল সমীপেষু,

বাবাজী!

আপনি গাঁজার ঘোরে ভুল দেখিয়াছেন। আপনার নাম চিহ্ন নকল করা হয় নাই, ছবিটি বিখ্যাত শিল্পী অহিনকুল মুখোপাধ্যায়ের আঁকা। নাম চিহ্ন অনেকটা আপনার ন্যায় হইলেও স্বাতন্ত্র আছে।'......

সুকান্তর চিঠি পেয়ে অরুণাচলের সমস্ত রাগ জল হয়ে গেল। আর নিজের ভুলের জন্য তিনি খুবই লজ্জিত হয়ে পড়লেন।

কিশোর বাহিনীর কর্মীদের তিনি যুগ পরিবর্তনের আদর্শে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন সমস্যা জর্জরিত দেশে শিশু, কিশোর, শিক্ষক, শ্রমিক, কৃষক অর্থাৎ সর্বস্তরের মানুষের প্রতি নির্যাতন, লাঞ্ছনা আর অন্যায়ের অবসান ঘটুক।

সুকান্ত ছিলেন চল্লিশের যুগের কবি।

কবি প্রতিভার মোড় ঘোরে ঠিক এই সময়েই। যখন পৃথিবীকে দেখার জন্য কৌতুহলী, সে সময়েই তার দিব্যদৃষ্টির মধ্যে ধরা পড়ে পৃথিবী ব্যাপ্তি যুদ্ধ, সংগ্রাম, হত্যা, মন্বন্তর, বন্যা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রভৃতি। এহেন নানা সমস্যায় সুকান্তকে করেছিল বিক্ষুব্ধ। তাই তার অধিকাংশ ভাল কবিতাগুলো লেখা হয়েছিলো ১৯৪০ সাল থেকে ১৯৪৬ সালের মধ্যে।

সুকান্তর কবি জীবনের গোটা সময়টাই কেটেছে কোলকাতা শহরে। তখন যে একের পর একটা নাটকীয় দৃশ্য এই শহরের বুকে ঘটছে আর সেগুলো সুকান্তর মনে রেখাপাত করে গেছে গভীরভাবে। তাই তো দেখা যায় তার কবিতার ভাষা যেন তখনকার বিভিন্ন আন্দোলনের দলিল।

১৯৪০ সাল। দেশে চরম অস্থিরতা। সাম্রাজ্যবাদীদের ভয়ঙ্কর দাপট তখন সর্বত্র। পরাধীনতার নাগপাশে কবি সুকান্ত অবাক অনুভব করলেন—

অবাক পৃথিবী! অবাক করলে তুমি!
জন্মেই দেখি ক্ষুব্ধ স্বদেশ-ভূমি।

১৯৪১ সালের প্রারম্ভেই দেখা দিলো আকাশে জাপানী বোমারু বিমানের মহড়া। দলে দলে লোক পালিয়ে যাচ্ছে কোলকাতা শহর ছেড়ে। দিনের বেলায় পথ জনশূন্য। রাতে নিষ্প্রদীপ। পায়রার মতো মানুষ ঘরে বসে বসে নিঃশব্দে কেঁপেছে। শুধু শোনা গেছে মিলিটারি গাড়ী আর বুটের শব্দ। এই প্রেতপুরীকে সাম্যবাদী কবি সুকান্ত সহ্য করতে পারেন নি। ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তিনি চাইলেন প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখোমুখি দাঁড়াতে। তিনি সাবধান হন।

মনেরে জানায় সাবধান হুঁসিয়ার;
খুঁজে নিতে হবে পুরান হাতিয়ার
পাণ্ডুর পৃথিবীতে।

এক সময় যুদ্ধোন্মত্ত পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে বিপ্লবী কবি আরও বজ্রনির্ঘোষ ধ্বনিতে হুঙ্কার দিলেন—

পণ করো, দৈত্যের অঙ্গে
হানবো বজ্রাঘাত,
মিলবো সবাই এক সঙ্গে;
সংগ্রাম শুরু কর মুক্তির।

১৯৪২ সালে 'ভারত-ছাড়' সংগ্রামে ব্রিটিশ সরকারের বর্বর অত্যাচার ও ছাত্র সমাজের বীরত্ব দেখে সুকান্তও প্রতিশোধের শপথ নিলেন।

'জনযুদ্ধের গান' লিখলেন তিনি —

জনগণ শক্তির ভয় নেই
ভয় নেই আমাদের ভয় নেই।
নিষ্ক্রিয়তায় তবে কেন মন ভগ্ন
কেড়ে নাও হাতিয়ার, শুভলগ্ন।

১৯৪৩-৪৪ সালে মন্বন্তর, মহামারী ও বন্যার প্রকোপে দেশ জুড়ে ক্ষুধার্ত শিশু আর যন্ত্রণাকাতর মায়েদের বুক ফাটা কান্নার শব্দে সুকান্তকে পাগল করে দিয়েছিলো। আভিজাত্যের কেন্দ্রস্থল শহর কোলকাতা তখন মহাশ্মশানে পরিণত। এসময়েই সুকান্ত তার শ্রেষ্ঠ কবিতা 'বোধন' রচনা করেন। অন্তরে কামনা করছিলেন মহামানবকে—

হে মহামানব, একবার এসো ফিরে
শুধু একবার চোখ মেলো এই গ্রামে নগরের ভিড়ে,
এখানে মৃত্যু হানা দেয় বার বার ;
লোক চক্ষুর আড়ালে এখানে জমেছে অন্ধকার।
এই যে আকাশ, দিগন্ত মাঠ, স্বপ্নে সবুজ মাটি
নীরবে মৃত্যু গেড়েছে এখানে ঘাঁটি ;
কোথাও নেইকো পার
মারী ও মড়ক মন্বন্তর, ঘন ঘন বন্যার
আঘাতে আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন ভাঙা নৌকার পাল,
এখানে চরম দুঃখ কেটেছে সর্বনাশের খাল,
ভাঙাঘর, ফাঁকা ভিটেতে জমেছে নির্জনতার কালো
হে মহামানব, এখানে শুকানো পাতায় আগুন জ্বালো।

মন্বন্তরের করাল গ্রাসে বাংলা হলো মহাশ্মশান। এই বীভৎস রূপের সামনে দাঁড়িয়ে স্বজন নিধনকারী বেইমান, সমাজ বিরোধী,

স্বার্থপর মালিক আর মজুতদারের বিনাশে সুকান্ত প্রতিজ্ঞা মন্ত্র উচ্চারণ করলেন—

…শোন্‌রে মালিক, শোন্‌রে মজুতদার
তোদের প্রাসাদে জমা হলো কত মৃত মানুষের হাড়,
হিসাব কি দিবি তার ?
প্রিয়াকে আমার কেড়েছিস তোরা,
ভেঙেছিস ঘর বাড়ী
সে কথা কি আমি জীবনে-মরণে
কখনো ভুলতে পারি ?
আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই
স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের
চিতা আমি তুলবই।…

দুর্ভিক্ষ যে সুকান্তকে কতখানি আঘাত দিয়েছিলো, তা যথার্থ ভাবে বুঝতে হলে পড়া দরকার 'এই নবান্নে', 'বোধন', 'ফসলের ডাক', 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' প্রভৃতি কবিতাগুলো। 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতায় বলেছেন…

আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতিক্ষায়,
আমার বিনিদ্র রাতে সতর্ক সাইরেন ডেকে যায়।

১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসে আজাদ-হিন্দ ফৌজের বন্দীদের মুক্তির দাবীতে ছাত্রদের বিপ্লব শুরু হয়। তারপরই ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারীতে রসিদ আলি দিবসে গুলি চালনার ও হত্যার প্রতিবাদে শুরু হলো সৈন্যদের সাথে পথ যুদ্ধ। এই ঘটনার সুকান্ত শুধু সাক্ষী নয়, শরিক। তাই বিদ্রোহী সুরে লিখলেন—

দেখবো ওপরে আজো আছে কারা
খসাবো আঘাতে আকাশের তারা

সারা দুনিয়াকে দেবো শেষ নাড়া
ছড়াবো ধান
জানি রক্তের পেছনে ডাকবে
সুখের বান।

১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে কোলকাতায় আকাশবাণী কেন্দ্রে শিল্পী ও কর্মীদের ধর্মঘট, ডাক-তার কর্মীদের ধর্মঘট, করাচী আর বোম্বে নৌ-বিদ্রোহ, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে পুলিশী ধর্মঘট ও হরতাল চলছে। চারিদিকে বিপ্লব। সুকান্ত লিখলেন '১৯৪৬' কবিতা—

বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারিদিকে
আমি যাই তারি দিন-পঞ্জিকা লিখে
এত বিদ্রোহ কখনো দেখেনি কেউ,
দিকে দিকে ওঠে অবাধ্যতার ঢেউ।

একদিকে যেমন পূর্ণ্যোদ্যমে যুদ্ধ চলেছে, ঠিক অন্যদিকে তেমনি সুকান্ত ও সমান তালে করে যাচ্ছিলেন পার্টির কাজ আর কাব্য সাধনা। কমিউনিস্টপার্টির কেন্দ্রিয় আফিস তখন ডেকার্স লেনে। সুকান্তকে সেখানে যেতে হতো দিনে বেশ কয়েকবার। চাঁদা আদায়, পোস্টার লাগানো, স্বাধীনতা পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা বাড়ানো, এছাড়াও বিভিন্ন কিশোর বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা, সবই তাকে করতে হতো পায়ে হেঁটে। দারিদ্রতাই তাকে বাধ্য করেছিলো। ফলে অপরিসীম কাজের চাপে এবং দীর্ঘদিন অনিয়মিত স্নান আহারের দরুণ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। চিকিৎসক নিযুক্ত হলো। চারদেওয়ালে ঘেরা ছোট গণ্ডিতে আটকা পড়লেন সুকান্ত। শয্যায় শুয়ে শুয়ে তিনি উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতেন দেশ-বিদেশের নানা সংবাদ শোনার জন্য। আর রোগশয্যায় শুয়েও ভুলতে পারেননি তার প্রিয় কলমকে।

বেশ কিছুদিন পার হলো। চিকিৎসার ফলে তিনি খানিকটা সুস্থ হলেন। এখন পুরোপুরি বিশ্রামের প্রয়োজন। কিন্তু বিশ্রাম নেবেন কি করে! একদিকে পরীক্ষা, তারজন্য প্রস্তুত হতে হচ্ছে তাকে। আবার অন্যদিকে পার্টির কাজ। সুতরাং বিশ্রাম নেবার সময় এবং সুযোগ কোনটাই হলো না। পরিশ্রমের ফলে পুনরায় অসুস্থ হয়ে পড়লেন তিনি। শয্যা নিতে হলো তাকে। কিন্তু বিছানায় শুয়ে থাকার ছেলে নন তিনি। তার চোখে যেন নেমে এলো নৈরাশ্যের জাল। মনে অনুভব করলেন গভীর যন্ত্রণা। সুকান্ত লিখলেন বন্ধু অরুণাচলকে—

'শরীর-মন দুই-ই দুর্বল। অবিশ্রান্ত প্রবঞ্চনার আঘাতে আঘাতে মানুষ সময় সময় পৃথিবীর উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠে ঠিক সেই সময় এসেছে আমার জীবনে। হয়তো এটাই মহত্তর সৃষ্টির সময়। (ভয় নেই আঘাতটা প্রেমঘটিত নয়)। আজকাল অন্যদিকে কেবল হতাশার শকুনি উড়তে দেখছি। হাজার হাজার শকুনি ছেয়ে ফেলেছে আমার আকাশ। গত বছরের আগের বছর থেকে শরীর বিশেষ ভাবে স্বাস্থ্যহীন হবার পর আর বিশ্রাম পাইনি ভালমতো, একান্ত প্রয়োজনীয় বায়ু পরিবর্তন ঘটেনি আমার সময় ও অর্থের অভাবে। পার্টি আর পরীক্ষার জন্য উঠে দাঁড়ানোর পর থেকেই খাটতে আরম্ভ করেছি। তাই ভিতরে ভিতরে অনেক ফাঁক থেকে গিয়েছিলো। বুঝতে পারিনি আমার স্বাস্থ্যের অযোগ্যতা।···আমার লেখক সত্তা অভিমান করতে চায়, কর্মী-সত্তা চায় আবার উঠে দাঁড়াতে।···কিন্তু কি করে ভুলি দেহ আর মনে আমি দুর্বল, একান্ত অসহায় আমি।"

দেহ বিশ্রাম চাইলেও মন চায় না। তাই আবার ১৯৪৫ ও ১৯৪৬ সালের বিভিন্ন গণ-আন্দোলনগুলোর পুরোভাগে অসুস্থতাকে অগ্রাহ্য করে পতাকা হাতে এসে দাঁড়ালেন সুকান্ত। তাই 'অনন্যোপায়' কবিতায় দেখা যায় বিদ্রোহী কবি-মনকে।

বার বার ব্যর্থ তাই আজ মনে এসেছে বিদ্রোহ,
নির্বিঘ্নে গড়ার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে ছিন্ন ভিন্ন মোহ।
আজকে ভাঙ্গার স্বপ্ন—অন্যায়ের দম্ভকে ভাঙ্গার,
বিপদ ধ্বংসেই মুক্তি, অন্যপথ দেখি নাকো আর।

১৯৪৬ সালের মাঝামাঝি। সুকান্ত আবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এবার তাকে ভালভাবেই শয্যা নিতে হলো। বাড়ীর লোক, আত্মীয়, বন্ধু এবং শুভানুধ্যায়ীরা বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ক্রমশঃ তাকে বাড়ীতে রেখে চিকিৎসা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু বাইরেইবা রাখা যায় কি করে! একদিকে দাঙ্গা অন্যদিকে ব্ল্যাকআউট। নাগরিক জীবন পর্যুদস্ত। প্রথমে সবাই ভেবেছিলেন দুর্বলতা জনিত এ জ্বর।

ডাক্তার রাম অধিকারী ও ডাক্তার তাপস বোস উভয়ের যৌথ পরামর্শে চিকিৎসা চলছিলো। এক্সরে করা হলো। ধরা পড়লো টি, বি রোগ। প্রথমে সুকান্তকে গোপন রাখা হয়েছিলো। কিন্তু বেশী দিন গোপন রাখা সম্ভব হয়নি।

সুকান্ত তার বন্ধু ও সম্পর্কে ভাইকে এক চিঠি লিখলেন ১৯৪৬ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর—

"আমার রোগ এমন একটা সন্দেহ অবস্থায় পৌঁচেছে যা শুনলে তুই অবাক হয়ে চোখে এক ধরনের ফুল দেখতে পারিস। ডাক্তারের নির্দেশে সম্পূর্ণ শয্যাগত আছি।…"

না, আর বাড়ীতে নয়। ডাক্তার থাকলেও অষুধ সংগ্রহ করা অসাধ্য হয়ে দাঁড়ালো। এই দুর্দিনে তৎকালীন ছাত্রনেতা অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য সুকান্তর হাসপাতালে ভর্তি করার ব্যবস্থা করে দিলেন। পার্কসার্কাসের ১০ নম্বর রাউডন ষ্ট্রীটের 'রেড এণ্ড কিওর হোমে'। প্রথম প্রথম দিনগুলো ভালই কাটছিলো সুকান্তর। কিছুদিন পরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে তার সঙ্গে নিয়মিত দেখা করতে পারতেন না বাড়ীর লোক এবং বন্ধুরা। সুকান্তও যেন হাঁপিয়ে উঠলেন ক্রমশ।

তার মনেও যে অস্থিরতা দেখা দিয়েছিলো তা তার চিঠিতেই প্রকাশ পায়।

'...এক রকম বৈচিত্রহীন ভাবেই দিন কাটছে, যদিও বৈচিত্রের অভাব নেই। অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ খবর পেয়ে আমাদের এখানে এসেছিলেন—সেই একটা বৈচিত্র্য।....তবে আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় দিন গেছে, মুক্ত বিপ্লবীরা সদলবলে (অনন্ত সিং বাদে সবাই আমাদের এখানে এসেছিলেন। অনুষ্ঠানের পর তারা আমাদের কাছে এলেন আমাকে শুভেচ্ছা জানাতে। বিপ্লবী সুনীল চাটার্জী আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। আর একজন বিপ্লবী তাঁর গলার মালা খুলে পড়িয়ে দিলেন আমায়। ফ্রান্সে ও আমেরিকায় আমার জীবনী বেরুবে যেদিন শুনলাম সেদিনও এত সার্থক মনে হয়নি আমার এই রোগজীর্ণ অশিক্ষিত জীবনকে। কাল সন্ধ্যার একটি ঘণ্টা পরিপূর্ণতায় উপচে পড়েছিলো।...হাসপাতালের ছককাটা দিন ধীর মন্থর গতিতে কেটে যাচ্ছে।...ঝির ঝির করে হাওয়া বয় সারাদিন। রাত্তিরে চাঁদের আলো এসে লুটিয়ে পরে বিছানায়! ডালহাউসী স্কোয়ারের অফিসে বসে কোন দিনই অনুভব করতে পারবি না এই আশ্চর্য নিস্তব্ধতা। এখন দুপুর কিন্তু চারিদিকে এখন রাত্রির নৈঃশব্দ। শুধু মাঝে মাঝে মোরগের ডাক স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, এটা রাত্রি নয়—দিন!'....

এদিকে সুকান্তর অসুখের এই দুঃসবাদ ছড়িয়ে পড়লো চারিদিকে। তার হিতকাঙ্ক্ষীদের কণ্ঠে ধ্বনি উঠলো, সুকান্তকে হারানো চলবে না। তাকে বাঁচাতেই হবে। কিন্তু এ যে রাজসিক রোগ—চাই প্রচুর অর্থ।

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় বিশেষ ভূমিকা নিলেন অর্থ সংগ্রহের জন্য। গানে সুর ধরলেন কণ্ঠশিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও সুচিত্রা মুখোপাধ্যায়। আর তাদের বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন শ্রীমতী অলকা উকিল। বেশ অর্থ সংগ্রহ হতে লাগলো বিভিন্ন

অনুষ্ঠান আর সঙ্গীতের আসরে। পার্টির কর্মীরাও তার চিকিৎসার কথা ভাবতে শুরু করেছেন। বিহারে স্যানিটোরিয়ামে রেখে তার চিকিৎসা করানো যায় কিনা চেষ্টা করতে লাগলেন কমিউনিস্ট পার্টির শ্রদ্ধেয় নেতা মুজফ্‌র আহমেদ।

সংবাদ শুনে আন্তরিক মর্মাহত হলেন সাহিত্যিক স্বর্গত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি কবি বিষ্ণু দে-কে জানালেন চাঁদা তোলার ব্যবস্থা করতে। দেশের সব শ্রেণীর জ্ঞানী-গুণীরা সুকান্তকে বাঁচাতে উঠে পড়ে লাগলেন। বলিষ্ঠ সাহিত্যিক স্বর্গত মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় কবিকে কতটা ভালবাসতেন তার প্রমাণ তিনি দিয়ে গেছেন স্বাধীনতা পত্রিকা মাধ্যমে একটি কবিতা লিখে—

আমরা চাঁদা তুলে মারব সব কীট,
কবি ছাড়া আমাদের জয় বৃথা।
বুলেটের রক্তিম পঞ্চমে কে চিরবে
ঘাতকের মিথ্যা আকাশ ?
কে গাইবে জয় গান ?
বসন্তের কোকিল কেশে কেশে রক্ত তুলবে
সে কিসের বসন্ত !

সংগ্রহ শুরু হতে লাগলো অর্থ। আর এই অর্থের বিনিময়ে যাদবপুর টি, বি হাসপাতালে একটা বেডও পেয়ে গেলেন তিনি। পেয়িং বেড।

লেডি মেরী হার্বার্ট ব্লকের এক নম্বর বেডে শুয়ে থাকতেন সুকান্ত। নিজের শয্যায় শুয়ে শুয়ে জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত স্বপ্ন দেখেছেন, একটি কেবিন ভাড়া নিয়ে তার জেঠাইমাকে কাছে রাখবেন। উপযুক্ত যত্নে তিনি আবার সুস্থ হয়ে উঠবেন। ফিরে যাবেন বাড়ীতে। না, তার সে আশা সফল হয়নি আর।

হাসপাতালে নিতান্ত অযত্নে এবং অবহেলায় সুকান্তর দিন কাটতে লাগলা। ডাক্তার ও নার্স'রা তার হিতকাঙ্ক্ষীদের কাছ থেকে বকশীস হিসাবে অনেক অর্থ নিয়েও তার উপযুক্ত যত্ন করতো না। ফলে তিনি ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছিলেন নিষ্ঠুর মৃত্যুর দিকে।

দেখতে দেখতে আরও বেশ কয়েকটা দিন কেটে গেল। কেটে গেল কতগুলো রাত। এই ভয়ঙ্কর রাতগুলো যেন হাসপাতাল চত্বরটিকে গ্রাস করতে চাইতো। দুর্বিসহ হয়ে উঠতো রুগীদের জীবন।

১৯৪৭ সালের ১২ই মে এমনি একটি গভীর রাতে সুকান্ত মারা গেলেন। সবাই তখন ঘুমন্ত। কেউ জানলো না, কেউ বুঝলো না, কখন কি ভাবে এক নম্বর শয্যার মেয়াদ ফুরিয়ে গেল।

দেশবাসী সুকান্তর মৃত্যু সংবাদ পেলেন পরদিন স্বাধীনতা পত্রিকা মারফৎ। রসিক সমাজ ব্যথিত ও আশাহত হলেন একজন অসাধারণ কিশোর কবির অকাল বিয়োগে। কমিউনিস্ট পার্টি হারালেন একজন নিষ্ঠাবান সহকর্মীকে। আর তার বাড়ীর লোকেরা হারালেন তাদের প্রতিভাধর স্নেহের সুকান্তকে।

সুকান্ত লিখেছিলেন···

আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে
করে যাব আশীর্বাদ,
তারপর হব ইতিহাস।

কবিজীবনের প্রথম দিকেই তিনি এই চিরসত্য বাণীটি লিখেছিলেন। আজ তিনি ভারতে এবং ভারতের বাইরেও কবি সুকান্ত নামে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। বাংলা সাহিত্যে তিনি প্রতিভার কৃতিত্বে লাভ করেছেন স্থায়ী আসন।

সত্যি, সুকান্ত আজ ইতিহাস হয়ে উঠেছেন।

সুকান্ত চলে গেলেন।

তার তিরোভাবের পর এদেশের উপর দিয়ে পার হয়ে গেল দীর্ঘ চব্বিশটা বছর।

স্মৃতিকে বহন করে সময় এগিয়ে চলেছে।

এই দীর্ঘ সময়ে কত ঝড় বয়ে গেল দেশের উপর দিয়ে। বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মন্ত্রিত্বের লড়াই, দাঙ্গা, নারকীয় হত্যালীলা, রাজনীতির ঘৃণ্য চক্রান্ত আরও কত রকম বিষাক্ত পরিস্থিতিতে মানুষ আজ দিশেহারা।

প্রতিটি মানুষ আজ বিভ্রান্ত।

আশ্চর্য! এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এমন একজন শক্তিশালী কবির আবির্ভাব ঘটলো না এদেশে, যার কবিতায় আমরা নতুনভাবে উদ্বুদ্ধ হতে পারি। নতুন প্রেরণায় এগিয়ে যেতে পারি। যার কবিতার বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে আমরা নতুন আলোর ইংগিত পেতে পারি।

না, আজও সম্ভব হয়নি।

না হোক, তবু হতাশ হবো না। অপেক্ষা করবো সেই দিনের জন্য, যে দিন কোন কবি তার ভাষায় আমাদের বিভ্রান্ত মনকে সংযত করতে পারবেন। নতুন পথের নিশানা দেখাবেন। নতুন আশার বাণী শোনাবেন তার কবিতায়।

আজ জটিল পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে সেদিনের অপেক্ষাই করবো। পদধ্বনি শোনার জন্য প্রতীক্ষায় থাকবো।

আজও যখন আমরা যন্ত্রণার মিছিলে আঘাতে আশাহত হয়ে পড়ি, সেই মুহূর্তেই যেন সুকান্তর কবিতায় আশার আলো খুঁজে পাই।

তাই মনে সান্ত্বনা, সুকান্ত চলে গেলেও হারিয়ে যান নি। সুকান্ত হারাতে পারেন না। হৃদয়ের মণি-কোঠায় অক্ষয় হয়ে আছেন। থাকবেন-ও।

সুকান্ত সর্বযুগের কৈশোরের প্রতিনিধি নিঃসন্দেহে।

তাই তার প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে

তাকে স্মরণ করেছেন বাংলাদেশের প্রত্যেক সাহিত্য-রসিক ব্যক্তিই।

সুকান্ত ও তার নিষ্ঠার প্রতি আন্তরিকতা জানিয়ে কবি সাহিত্যিকগণ একান্তভাবে অন্তরের ভালোবাসা ব্যক্ত করেছেন। এখানে কয়েকজনের উক্তি উদ্ধৃত করলাম সুকান্তকে আরও ভাল করে বোঝার জন্য। জানার জন্য।

সুকান্তর সংক্ষিপ্ত জীবনের শেষের দিকের দিনগুলোতে তাকে কাছে পাবার সুযোগ পেয়েছিলেন শ্রদ্ধেয়া সরলা বসু। তিনি তার স্মৃতিচারণে বলেছেন—

"চলয়মান জীবনের পাওয়া শ্রেষ্ঠ মণিটি হারিয়ে গেল। যে বনস্পতি মাথা তুলে দাঁড়াতে চেয়েছিলো, বড় সাধ ছিলো, বড় আশা ছিলো তার বিপুল সম্ভাবনার সম্পূর্ণতা বোঝার।"

কবি সুকান্তর অকাল বিয়োগে তাকে উদ্দেশ্য করে কবি বিষ্ণু দে জানালেন—

"ভোরের সূর্যে রক্তের স্বাদ লাগে
সে কার রক্ত
বীরের রক্তস্রোত কেন জাগে মাতার অশ্রুজলে
মাতার রক্তে পথের ধূলায় জাগো
সূর্যোদয়ের রাঙ্গা
শক্ত আলোর পাঙাশ দিনের চুরমার হাহাকার
হে নব জীবন আনো যৌবন নীলাকাশ জ্বলজ্বলে।"

শ্রদ্ধেয় কথা সাহিত্যিক স্বর্গত মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় আক্ষেপ করে বলেছিলেন—

"সমগ্র দৃষ্টিতে সুকান্তর সৃষ্টির বিচার আজ বিশেষভাবে দরকার। গ্রহণ করার দিক থেকে ধরলে আমরা সত্যই সুকান্তর কাছে অপরাধী হয়ে আছি—ঠিকভাবে তাকে গ্রহণ করতে পারিনি, যথাযোগ্য মূল্য দিইনি।"

সুকান্তকে উদ্দেশ্য করে স্বর্গত সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন—

"রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন সর্বমানুষের জীবন যাত্রার মর্মকথাটিকে সহজভাবে উদঘাটন করতে কবিকে আকাশ থেকে পৃথিবীতে নেমে আসতেই হবে।

প্রাচীনের নির্বিকার স্বীকৃতি যখন সমাজের মনকে জড়তায় অসাড় করে তোলে তখন স্বপ্নের যোগ-নিদ্রা হতে কবিকে জাগাতে হবে।

শেষ জীবনে বাংলা কাব্যের এই নব জন্মের জন্য রবীন্দ্রনাথ প্রতীক্ষা করেছিলেন। কিন্তু তখন ডাক্টসার্স শৌখিন মজদুরি তাঁর প্রত্যাশাকে ব্যঙ্গ করেছিল। এ সম্বন্ধে আমার যেটুকু পড়া শোনা আছে তাতে আমার মনে হয়েছে যে সাধারণ মানুষের গ্লানি সহজ মর্যাদায় প্রথম বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে সুকান্তর কাব্যে।

সাধারণ মানুষের জীবনকে সমবেদনার অন্তর্দৃষ্টিতে দেখবার যে শক্তি সুকান্তর কাব্যের প্রতি ছত্রে অনুরণিত হয়ে উঠেছে সে শক্তি সুকান্ত লাইব্রেরী বিহারনী সরস্বতীর কাছে পায়নি, সে শক্তি সুকান্ত লাভ করেছিলেন জীবনের পাঠশালায় যার অধিষ্ঠান মাঠে, গ্রামে, বস্তিতে, মিলে, রাজপথে।

আমাদের মধ্যে জীবনের আকাঙ্ক্ষাকে মুখর করে তোলার তপস্যায় সুকান্ত তাঁর বাঙ্ময় জীবনকে আহুতি দিয়েছেন।

আমি বিশ্বাস করি, ইতিহাসের অমোঘ অস্ত্রশালায় এই কবি-দধীচির অস্থিমালা দিয়ে যে বজ্র তৈরী হবে অদূর ভবিষ্যতে বঞ্চিত মানুষের বুকে তার ক্ষমাহীন নির্ঘোষ শোনা যাবে।"

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় সুকান্তর জীবনের প্রথম থেকেই তার কাব্যের দর্শক। তিনি তার ভিতর এমন বিরাট প্রতিশ্রুতির সম্ভাবনায় মুগ্ধ হয়েছিলেন, সুকান্তকে আপন করে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। তাই তার অকাল বিয়োগে তিনি লিখলেন—

"যৌবনের পদ প্রান্তে যে কৈশোরের ছিন্নশির উপহার দেয়
বসন্তকে পুড়িয়ে মারে দাউ দাউ দাবাগ্নি শিখায়
যে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় স্বপ্নের দড়ি নাকে দিয়ে
বঞ্চনার অভিশপ্ত পথে
সুকান্ত, তোমার সেই আততায়ীকে
পৃথিবীর বুক থেকে মুছে দিয়ে
তোমাকে বাঁচাবো।"

সুকান্তর তিরোভাবে বেদনার মাধ্যমে কবি বিমল চন্দ্র ঘোষ বিস্ময়কর প্রতিভায় উদ্ভাসিত কিশোর কবিকে উদ্দেশ্য করে লিখলেন—

"আহা নবযুগে নওল কিশোর
কেঁদে ফিরে গেল সারা নিশিভোর
মুছে গেল কালবৈশাখী মেঘে
শিশু সূর্যের রক্ত
এ যে নিদারুণ সত্য।"

কবি অলোক রঞ্জন দাশগুপ্ত সুকান্তর অকাল বিয়োগে মর্মাহত হলেন। তার অন্তরে ছিলো কিশোর কবির জন্য অশেষ মমতা। তারই জন্য বুঝি তার কবিতায় সংগ্রামের ছন্দ ধ্বনিত হয়।

"সুকান্ত, আমারো চোখে ঘুম নেই আজ
কাকদ্বীপের কান্না শুনি নবজাতকের,
পিশাচেরা কেড়ে নেয় মুঠি মুঠি ধান
বুলেটে হয়েছে বিদ্ধ তাজা তাজা প্রাণ
মাটি হয়ে ওঠে লাল রক্তে মৃত-শহীদের
সেখানে হাজারো তুমি, কার্তিক-শিশির-ভরদ্বাজ।"

সুকান্তর তিরোভাবে কবি গোবিন্দ চক্রবর্তীর হৃদয়েও জেগে উঠে গভীর মমতা। তাই তারও কবিতায় ধরা পড়লো সংগ্রামের সুর—

"নগরে, বন্দরে, প্রান্তরে
তোমার স্বপ্নের মেঘ বৃষ্টি হয়ে ঝরে
রোল তোলে সে কোন সিন্ধুর।
বাঁজা ভাঙাতে ও তাই আশ্চর্য অঙ্কুর
মাথা তোলে আজ।
আর বেশী দূরে নয় প্রাণের সমাজ।"

সুকান্তর মৃত্যুতে ব্যথা-বেদনায় জর্জরিত কবি মনীন্দ্র রায় লিখলেন—

"দেহ তো সবাই জানে
কালের আহার ;
সময় চিবোয় নিত্য
মেদ মজ্জা যত উপাচার।
কিন্তু কেউ কেউ থাকে
খায় যে সময়
কালের গরল বুকে
চিরায়ু সে স্মৃতির সঞ্চয়।
তেমনি সুকান্ত তুমি
আমাদের ও ঘরে
চোখের আড়ালে চোখ
স্পর্ধা তুমি মৃত্যুর শিয়রে।"

কবি কামাক্ষী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সুকান্তকে স্মরণ করলেন ব্যথা বেদনার মধ্য দিয়ে। তিনি লিখলেন—

"অকস্মাৎ মনে হয় মেঘে মিশে নবধারাজলে
তোমার চিতার ছাই রাশি রাশি সোনার ফসলে
"ঝরবে বাংলার ক্ষেত্রে মজুরের কৃষকের গানে
আবার বাঁচবে তুমি এ মাটির উদ্দাম আহ্বানে।"

কবি অরুণ মিত্রের ভাষায় আক্ষেপের সুর। তিনি বেদনার মধ্য দিয়ে অনুভব করলেন সুকান্তকে। লিখলেন—

"মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত রোদের দিকে তাকিয়ে কি ভেবেছিলো সুকান্ত ?...ভালবাসার আশায়, নৈরাশ্যে মৃত্যুর, আরোগ্যের, সংগ্রামের সেই তীব্র হারানো ভাষা যাদবপুরের রোগীদের বিছানায় ছড়িয়ে আমাদের সকলের ঘরে এসে তোলপাড় বাধিয়ে দেবে।...রোগের একটা ঝলক যদি সুকান্তের অন্ধকার অস্ত্র আর ফুস্‌ফুসের মধ্যে ঢুকতে পারত।"

সুকান্তকে চলার পথের সঙ্গী করে নেওয়ার জন্য সিদ্ধেশ্বর সেন লিখলেন—

"সুকান্ত, তুমি আমার সাথে চলো।
সুকান্ত, তুমি আমাকে গান শোনাও।
আমি চটকলের লোহাকলের ধর্মঘটী ভাই,
ভুখা আছি, তবু মাথা না নোয়াই,
শত্রুকে চিনেছি ঠিক
তুমি শুধু হেঁকে বলো
সুকান্ত, তুমি আমার আগে দাঁড়াও।"

সতীন্দ্রনাথ মৈত্র কিশোর কবি সুকান্তকে উদ্দেশ্য করে লিখলেন—

"সুকান্ত, তুমি অবিনশ্বর শান্তির প্রদীপের মতো—
আমাদের চোখের তারায় তারায় জ্বলছ।"

সুকান্তর অকাল বিয়োগে জনতার কবি হারিয়ে গেলেন। তাই কবি রামেন্দ্র দেশমুখ্য 'নতুন দিন' নামক কবিতায় সুকান্তকে উদ্দেশ্য করে লিখছেন—

"জনগণ,
জংগীকাব্যের কিশোর ভগীরথ ছিল সুকান্ত এদেশে
সে ক্ষুধিত মজুর, তবুও পাখা জয়োন্মত্ত
ছিল লাল প্রতিবিম্ব মুক্তির পতাকা চোখে তার
চিনলাম কেবল মৃত্যুর পরেই তাকে
সেই কবি শ্রমিক, কবি কৃষক, দৃপ্ত কিশোরকে
'কলমের' আত্মসমর্পণের আগে তার
বিদ্রোহের ডাক।...."

কবি গোলাম কুদ্দুস সুকান্ত প্রসঙ্গে বলেছেন—

"আমার পরে জন্মগ্রহণ করে আমার অনেক আগে মৃত্যু বরণ করে সুকান্ত এখন অমর। এই অমরত্ব সুখের নয়, তবু একমাত্র সান্ত্বনা।

বাংলার সাহিত্যিকবৃন্দ এবং পাঠকবর্গের চোখে সুকান্ত যেন অশ্রুবিন্দুর মতো। তেমনি করুণ, তেমনি নিস্তব্ধ, পবিত্র সুন্দর।

জীবন-প্রভাতেই শিশির কণার মতো সে মিলিয়ে গেল।

ঘাসের ডগার এক ফোঁটা জলের বুকে যেমন সূর্য নিজের আগুনের দীপ্তি ফুটিয়ে তুলতে পারে, তেমনি সংগ্রামী যুগ এবং মানুষ সুকান্ত জন্মকালীন জীবনের স্বমহিমায় প্রতিভাত হতে পেয়েছিলেন। লেখায়, চরিত্রে, সাংগাঠনিক শক্তিতে।"

বিখ্যাত লেখক ভবানী মুখোপাধ্যায় সুকান্তর কথা বলতে গিয়ে শুরু করলেন—

"যুগ-সচেতন কবি সুকান্ত, একুশ বছর বয়সেই বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ মুখর যুগান্তরের অশান্ত কলোরোল শুনেছিলেন, তাই তাঁর কাব্যে সে সুর প্রধান হয়ে উঠেছে, সে সুর পালা বদলের নয়, দিন বদলের পালা শুরু।"

'বসুমতী' পত্রিকার সম্পাদক স্বর্গত প্রানতোষ ঘটক সুকান্তকে

খুবই স্নেহ করতেন। তাই কবির মৃত্যুতে অশ্রুসজল কণ্ঠে বলেছিলেন—

"আজও মধ্যে মধ্যে সুকান্তর লেখা চিঠিগুলি পরশমণির মতো নাড়া-চাড়া করি। বুঝতে পারি কখনও কখনও চোখের জল কোন বাধ মানে না।"

বিখ্যাত সমালোচক ও অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য সুকান্তর অকাল-মৃত্যুর পর 'কবি কিশোর' নামে একটি তথ্যপূর্ণ আলোচনা করার সময় লিখেছেন—

"....এ বিশাল পৃথিবীতে বসন্ত এখনো বেঁচে আছে। চিরকালই থাকবে। কিন্তু কবি কিশোরের জীবনের বসন্ত আর কোন দিনই এলো না। অনাগত বসন্তের প্রতীক্ষায় বসে থাকার সময় আর সুযোগও তার হল না। নবজাতকের কাছে সে অঙ্গীকার করেছিল, অনাগর বসন্ত দিনের এ বিশ্বকে নবজাতক শিশুর বাসযোগ্য করে যাবার জন্য দু'হাত দিয়ে প্রাণপণে এ পৃথিবীর জঞ্জাল সরাবে, সুকান্ত আমরণই সেই প্রতিশ্রুতিই পালন করে গেছে। জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তুপ পিঠে নিয়েই সে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেল। তার দেহের রক্ত দিয়েই সে নতুন শিশুকে আশীর্বাদ করে গেল। সে আশীর্বাদ কি ব্যর্থ হবে?"
